কম বয়সের আমি

মানসী দাশগুপ্ত

যামিনী প্রকাশ ভবন
১০৬/১, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীমতী শান্তি সান্যাল
১০৬/১, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ : দোলপূর্ণিমা—১৩৬১

প্রচ্ছদ শিল্পী :
গৌতম রায়

দাম—দশ টাকা

মুদ্রক :
শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
জয়ন্তী প্রিন্টিং প্রেস
৮/এ, দীনবন্ধু লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

পরিবেশক :
স্যাঙ্গুইন পাবলিশার্স কনসার্ন
৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৯

থ্রী-বি পার্ক সাউথের

বন্ধুদের

ত্রিশের দশকে কলকাতা ছিল উত্তরে। কলকাতা মানেই উত্তর কলকাতার পাড়া, অলি-গলি, পথ-ঘাট, আর মাঠ চাও তো যাও গড়ের মাঠে। সাহেব পাড়া কি হাইকোর্ট আপিস পাড়া এসব হলো ঘুরে আসার জায়গা। সেখানে কোথায় রয়েছে চিড়িয়াখানা, কোথায় যাদুঘর—গড়ের মাঠের মতোই সেসব জায়গায় বাড়ির ছোটদের একা যেতে নেই। দরকারই বা কি তেমন যাওয়ার। উত্তরের চৌহদ্দিতে যা পড়ে তা-ই কতো!

আমাদের দশনম্বর হালসীবাগান রোডের বাড়ির একদিকের জানলায় বসলে পরেশনাথ মন্দিরের চত্বর দেখা যেত। অনেক রকম লোক আসতো যেত সেখানে। আমি কিন্তু সেদিকে বড় যেতাম না। ছোট ছোট হাত দিয়ে জানলার গরাদ ধরে যতক্ষণ পারি আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম বাড়ির অন্য একদিকে যেখান থেকে একটু জমিতে গরু বাছুর দেখা যেত, আর দেখা যেত পথের মানুষের আনাগোনা। পাড়াতে ভদ্র পরিবার ছাড়াও অনেক ঘর গোয়ালাও ছিল। খোলা খাটালে (তখন খাটাল কথাটা শুনি নি) তাদের গরু নিশ্চিন্তচিত্তে জাবর কাটত। গয়লানীরা সম্ভব অসম্ভব সকলরকম আয়ত্তগম্য দেয়াল জুড়ে ঘুঁটে দিত, এবং গোয়ালার ছেলেরা গলির মার্বেলপ্রিয় বালকদের সংগে গুলি খেলত, ভদ্র অভদ্রের ভেদ কিছুটা বড় না হওয়া পর্যন্ত ধরা পড়ত না।

ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চেপে অধিকাংশ বাড়ির মেয়েরা দূর পথে বেড়াতে যেতেন, কাছাকাছি চৌহদ্দিতে প্রশস্ত যান ছিল রিকশা। পুরুষ সঙ্গী নিয়েও বাসে ট্রামে হটর হটর করে বেড়ানোকে

সম্ভ্রান্ত জ্ঞান করা হতো না। পেটের জন্যে কলকাতায় পড়ে থাকা, তাই বলে কি বে-আব্রু হয়ে থাকতে হবে?—এই ছিল আমাদের বাড়ির মতো বেশ কয়েক বাড়ির মহিলাদের বক্তব্য। আব্রুর আকুলতাতেই এঁদের আভিজাত্য সীমাবদ্ধ ছিল। নতুন মটোর গাড়ি কিংবা চমক-তোলা ঘোড়ার গাড়ি এর কোনটিই এঁদের অধিকারে না থাকলেও ঢাকা গাড়িতে চেপে যাতায়াতের অভ্যাস এঁদের যায় নি। এঁদের আনা-নেওয়া করা একরকম বৃহৎ পর্ব ছিল। এই রক্ষণশীলতার উনিশ বিশ ছিল কলকাতার কোন কোন অঞ্চলে। বহু অভিজাত মহলেও সেখানে আব্রুয়ানা শিথিল হয়ে গিয়েছিল। পর্দাটানা বাস ছাড়া মেয়েদের স্কুলে, এমনকি, কলেজে যাওয়া সম্ভব—এরকম সাংঘাতিক কথাও অনেকে তখন বিশ্বাস করতে সুরু করেছিলেন। কিন্তু দশনম্বর হালসীবাগান রোডে সে আলো আঁধারের যুগে আঁধারির পরিসর কিছু অধিক ছিল। তবু সব মিলে কিছু একটা ছিল হালসীবাগানে, যাতে তুলনায় হাতীবাগানের মামাবাড়িকে নিতান্তই রুদ্ধশ্বাস মনে হতো। তার মানে অবশ্য এ নয় যে উনিশশো চৌত্রিশের যুগে ও বাড়ি থেকে মেয়েরা ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে পড়তে যায় নি, কিংবা বাড়ির মেয়েরা চলনদারের রক্ষণাবেক্ষণে উত্তরা কি শ্রীতে সিনেমা দেখতে যেতেন না। অন্যান্য বাড়িতে কে বা কারা ভাসঠাকুরকে দাদা বলে, এ খবরও তাঁরা রাখতেন। কাজেই শহরের চালচলতি বিষয়ে তাঁরা কম ওয়াকিবহাল ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। তবু প্রাচীনতা থেকে চ্যুত হবার প্রলোভন বোধ করেন নি তাঁরা কখনো। এক গলা ঘোমটা দিয়েও কত নিপুণভাবে কাজ করা যায়, আমার এক একটি মাসীমা তার নিদর্শন রাখার জন্য শপথ নিয়েছিলেন, অন্তত তাঁদের দেখে আমার তাই মনে হতো। ও বাড়িতে এবং আমাদের বাড়িতেও বউয়েরা বারব্রত করতেন। ব্রতকে বলা হতো বরতো।

গ্রীষ্মকালে আসন্ন মধ্যাহ্নে মা কথা শোনবার এবং শোনাবার জন্ম রিকশা চেপে মামাবাড়িতে যাচ্ছেন, আমরা চলেছি সঙ্গের সাথী, আমি আর দিদি, সপ্তাহে সপ্তাহে শুনে মঙ্গলাচণ্ডীর কথা প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে এসেছে—এ ছবি কতবার কত দুপুরে মনে পড়েছে পরে। রিকশাতে গেলে রিকশাওয়ালাকেই উপযুক্ত চলনদার বিবেচনা করা চলত, ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকে এরকম আস্থার সম্মানে সম্মানিত হতে দেখে নি। মঙ্গলচণ্ডীতে কথা শোনা হয়ে গেলে হাঁটুর ভাঁজের তল দিয়ে হাত ঘুরিয়ে এনে বাক্যহীন মা এবং মাসীমারা সিদ্ধ ভাত খেতেন। প্রসাদগ্রহণের এই বিচিত্র রীতি অন্য কোনো ব্রতে দেখি নি। ষষ্ঠীতে কি লক্ষ্মীপুজোয় অবশ্য মা তাঁর নিজের ঘরে আমাদের ডেকে নিয়ে ব্রত পালন করতেন। আমাদের গঙ্গার দেশে যত ষষ্ঠী আর লক্ষ্মীপুজো, মায়ের বাপের বাড়ির দেশে অত ছিল না,—বাঙাল বলেছে কি সাধে? এ কুলের বারব্রতগুলি একটিও ফেলেন নি মা। যতদিন পেরেছেন, তিথিগুলি সব পালন করেছেন বিনা আড়ম্বরে, কথা বলে। মায়ের মুখে ব্রত কথা সব কটিই বড় সুন্দর শুনেছি, তার ভিতরে অতি মনোহর ছিল ইতুর কথা। উমনো ঝুমনো আমার কাছে চতুর্দিকের জীবিত, মৃত, কথিত অথচ অনুপস্থিত আত্মীয় অনাত্মীয়ের চেয়ে কিছুমাত্র দূর কিংবা পর ছিল না। তারা যখন বলত,

সতাই, ছেলে তাঙরাও না
যার প্রসাদে এত তাই চেন না

—শুনে তাদের সৎ মা রাগ করে তাদের বনবাস দেবার ব্যবস্থা করতেন, উমনো ঝুমনোর সঙ্গে আমিও যেতাম বনে, লুকোতাম অশ্বত্থ বৃক্ষের দেহে! আর সকাল হলে "নমো নমো বরণে, তমো তমো বরণে. লোহার ডাঙ্গশ হাতে" ইতুরাম বাসদেব এসে উদয় হতেন আমারও সম্মুখে।

॥ ২ ॥

ব্রতপার্বণ উপলক্ষ্যে অনেক বাড়ির মহিলারা তখন গঙ্গাস্নানে যেতেন। আমার মা কিন্তু কলকাতা শহরে "গঙ্গা" বলে কলের জল মাথায় ঢেলেই খুশি থাকতেন অধিকাংশ সময়ে। একবার গঙ্গাপুজোয় ঘাটে গিয়েছিলাম আমরা। মা আর মামীমাদের সঙ্গে দলেবলে। ওরকম ভিড় আমার সেই প্রথম দেখা; মা ভয় পাচ্ছিলেন জলের বেগে যেন আমাদের গ্রাস না করে। আমি ভয় পাচ্ছিলাম ভিড়কে। ঘন সম্বদ্ধ মানুষ—বালক, বৃদ্ধ, নারী, পুরোহিত—তাদের কালো চুল, কারো বা খোঁপা, কারো টিকি। কারো আবার চুল নেই—মসৃণ টাক। আমার চোখের সামনে জমাট বেঁধেছিল এরা, স্থলে জলে আমি এদেরই দেখছিলাম শুধু। এরই মাঝখানে হঠাৎ সেজ মামীমার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল,তাঁর বড় সিঁদুরের ফোঁটা কপালে লেপে গেছে, মটকার শাড়ির আঁচল কাদায় লুটোচ্ছে, কাঁদতে কাঁদতে তিনি ভাঙা গলায় পুতুলকে ডাকছেন আর সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলে যাচ্ছেন কী করে তার হাত ছেড়ে পুতুল হারিয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে। পুতুল সেজ মামীমার মা-হারা মেয়ে। তাঁর নিজের এতগুলি সন্তান থাকা সত্ত্বেও ন' মামীমার রেখে যাওয়া পুতুল যে তার নয়নের মণি এসব কথাই সকলের জানা হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত আমরা যখন সব কজন মিলে ফিরে ঘোড়ার গাড়িতে উঠলাম তখন অবশ্য সেজ মামীমার সিঁদুর লেপে যাওয়া মুখে হাসি ফুটেছে, পুতুলকে পাওয়া

গেছে। কিন্তু এর পরে আর কোনদিন ঘাটে যাবার জন্য সম্মিলিত অভিযান করা হয় নি।

বিজয়াদশমীতে প্রতিমা বিসর্জন দেখবার জন্য ঘাটে যে ভিড় হতো সেখানেও মা যান নি কখনো, বলতেন, মণ্ডপ থেকে ঠাকুর চলে গেল, হয়ে গেল। ঘাটে বাচ বাওয়া কি ভদ্রঘরের মেয়েদের কাজ?

কলকাতায় থাকতে আমরা একবারই ঘাটে গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে। একটু হাঁটলেই হাঁপিয়ে পড়তাম আমি, অথচ বাবা কোলে নিয়ে হাঁটবেন না তো, তাই বড় বড় নিঃশ্বেস ফেলতে ফেলতে, তাঁর জামার ঝুল মুখের ভিতর পুরে চিবোতে চিবোতে হাঁটছিলাম আমি। খুব বিরক্ত হয়েছিলেন বাবা আমার জামা চিবোনো দেখে। এজন্য বকুনি অবশ্য খেয়েছিলেন বেশি আমার মা। বাড়ি ফিরে এমন গলায় বাবা বলেছিলেন, কী সব মেয়ে হয়েছে তোমার, কোত্থাও নিয়ে যাব না আর,—যেন আমার জামা মুখে পোরার জন্য মা-ই দায়ী। তাতে অবশ্য আমার বিবেক দংশন বেশি জোরালো হয়েছিল বা আমি যা পাই নিজের পরনের জামা, হাতের বালা, গলার হার--সেসব অন্যমনস্কভাবে মুখে পুরে দাঁতে কাটার অভ্যাস তখনি ছেড়ে দিয়েছিলাম—এমন নয়। এসব সত্ত্বেও বাবা আমায় নিয়ে বাল্যকালে কখনো বেরোন নি তা-ও নয়। কোন কোনদিন বাবা বেরোবেন, আমি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে এমন কান্না জুড়েছি যে বাবা আমায় কাঁধে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। কোলে কাঁধে উঠলে আমি মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ রেখে রাস্তা দেখতে দেখতে যেতাম। কত-যে দেখার জিনিস রাস্তায়। দেখতে দেখতে আমার ঘুম এসে যেত, বাড়ির কাছে এসে আবার তখুনি জেগে যেতে বিলম্ব হতো না। কিন্তু তখন আমায় বাড়িতে রেখে বাবা বেরিয়ে গেলে আর কাঁদতে বসিনি কোনদিন। দাদারা

এবং দিদি যদিও কেবলি বলতেন আমি বিষম কাঁদুনে, কিন্তু কান্না দিয়ে কতটা কাজ এগুনো যায় সে বিষয়ে আমার বাল্যে যথেষ্ট হিসেবী বিবেচনা ছিল বলে মনে হয়।

সেই বিবেচনাই আমাকে বুঝিয়ে দিত দাদাদের ছোটখাট উৎপাতে কখন কেঁদে ফেলতে হবে। কখন আবার সাধ্যমত গম্ভীর হয়ে শিশু শিক্ষা বইখানা নিয়ে বানান পড়তে হবে। শিশু-শিক্ষার পর্ব আমার কেটেছিল নিশ্চিন্ত সুখে। আমি তখন প্রায়ই শুনতে পাই আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারি, এখন হাতের অক্ষরের ছাঁদ তৈরি হয়ে উঠলেই হয়। তেঁতুলছড়া করে রাখবেন বলে মা বৌদিকে নিয়ে বসে বসে তেঁতুল কেটে ডাঁই করতেন যখন, আমার তখন কাজ ছিল কাঁইবীচি দিয়ে বাংলা বর্ণ তৈরি করা। মা-র কাছ থেকে কলম দোয়াত এবং কাগজ সংগ্রহ করা তখন খুব শক্ত কাজ ছিল। অক্ষর ভালো না হলে কি কাগজে লিখতে আছে? কাঁইবীচি তাহলে রয়েছে কেন? আর সেলেট পেন্সিল? সরস্বতী পুজোর পরের দিন সকালে অবশ্য বালির কাগজ আর খাগের কলম দিতেন মা না চাইতেই। ধোয়া দোয়াতে খয়ের গুলে নতুন কালি তৈরী করে তাতে খাগের কলম ডুবিয়ে একশ আট বার বালির কাগজে শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবী নমো নমঃ লিখে ফেলতে হতো। খয়েরের বদলে কালির বড়িও ব্যবহার করা চলত।

কাগজে আর কলমে অক্ষয় অধিকার ছিল দাদাদের। ঘরের মেঝের বসে ঐক্য বাক্য, মাণিক্য লেখার সময়ে সেইদিকে আমার চোখ পড়ে যাচ্ছে দেখলে মা বলতেন, লেখা থাক এখন, নামতা শোন।—কিংবা, মুখে পদ্য বলে যেতেন শুনে শুনে বলতে হতো॰

এ ভব ভবন মাঝে যখন যেদিকে চাই,
তোমার করুণারাশি কেবলই দেখিতে পাই।

অথবা,

সময় যায় নদীর ঢেউ, রাখিতে তায় পারে না কেউ,

রাখিতে তারে সে পারে ভাই, আলস্য যার শরীরে নাই।

পদ্য পাঠ মা-র অনেকটাই কণ্ঠস্থ ছিল। তেমনি মুখস্থ ছিল তাঁর নামতা। ইস্কুলে যাবার আগে পর্যন্ত মা আমার সঙ্গে লেখাপড়ার খেলায় যুক্ত ছিলেন। খেলার মতোই শিখেছি বাংলা গদ্য-পদ্য, ইংরেজী বি এল-এ ব্লে, গণ্ডাকিয়া, কড়াকিয়া, টাকা, আনা, পাই। হঠাৎ কখনো বাবাও যোগ দিয়েছেন এসে, টাকা, আনা, পাই কেন, পয়সা কেন নয় এসব বুঝিয়েছেন তিনি। ইস্কুলে গেলে পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স-এর অঙ্ক কষবো বলে রোমাঞ্চও জাগিয়েছেন বাবাই। পড়া-পড়া খেলা আমাদের চলতো নিয়মিত।

অন্য খেলাধুলোর জন্যে আমাদের দামী খেলনা কি পুতুল কিছুই ছিল না। খোলা হাওয়ায় যেতে চাইলে যাওয়ার জায়গা ছিল ছাদ। সেজদা ঠিক দাদাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেন খেলতে, বাবা ফিরবার আগেই ফিরতে হবে বলে খুব মাপা সময় ছিল তাঁদের খেলে আসার। ঐরকম একটুখানি বেরোনোর জন্যও আমার মন বড্ড অস্থির করতো! বেরোনো যেত না বলে আমি এক ঘর থেকে অন্য ঘরের চৌকাঠ লাফ দিয়ে পেরিয়ে ছুটবার সাধ মিটোতাম! মা এসব দাপাদাপির শব্দ শুনতে পেলে বলতেন, অমন অলক পায়ে লাফাতে নেই।—ছাদে উঠে গেলে তাঁর কান এড়ানো যেত খানিকটা। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে দিদি আর আমি লাফ খাওয়ার কম্পিটিশন দিতাম "জয় মা কালী পাঁঠা বলি" স্লোগানের সুরে।

ঐ সিঁড়িরই বড় ধাপে ছিল আমাদের খেলাঘরের কোণ। নতুন দেশী মিলের ধুতি শাড়ির গায়ে যে চকচকে ছবি লাগানো থাকতো। তারই গুটিকতক দেয়ালে সেঁটে কোণটিকে সুদৃশ্য করা হতো। আত্মীয়জনের সন্তানাদি এলে প্রায়ই তারা আমাদের এই

সামান্য গৃহসজ্জার উপকরণ তুলে নিয়ে যেত চলে। বাধা দেবার জোর পেতাম না একটুও। মা একরকম বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অবলীলাক্রমে বুঝিয়ে দিতে পারতেন যে বাধা দেওয়া দূরে থাক, প্রার্থীদের একটুও বিমুখ করার চেষ্টা করলে তার ফল ভালো হবে না। অন্য কারো বাড়িতে গেলে আমরা যেন তাদের ছুঁচেও হাত না দিই—এ বিষয়ে মা-র যেমন লক্ষ্য ছিল, তেমনি তাঁর উৎসাহ ছিল আমাদের কচি বয়সেই কতকটা দাতা তৈরী করে তোলার ব্যাপারে। এর ফলে, আত্মীয় স্বজন মহলে মা-র সন্তানদের খুব সুনাম ছিল। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে, ঐসব আত্মীয়স্বজন সূত্রে পাওয়া সমবয়সীদের প্রতি আমার মনে যে ভাব ছিল তাকে বিশুদ্ধ, প্রীতি পূর্ণ বলা যায় না। তারা এলেই এক অপ্রীতিকর সদনুষ্ঠানে আমাদের খেলাঘরের সঞ্চয় হারিয়ে যেত, তারপর খেলার কোণটি ভরে থাকতো শুধু কল্পনায়। বিনা খেলনার কত খেলা যে চলত সেখানে! এরকম মন ভোলানর খেলায় দিদি রান্নাবাড়িতে রত হতো। আমি যোগান দিতাম। বাঁ হাতের তেলোয় ডানহাতের আঙুলগুলি ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে মুখের কাছে এনে।

কয়া কয়া মাছের ঝোল, আর খাব না হাঁড়ি তোল—বলে তৃপ্তি পূর্বক আহার শেষ করা ছিল এ রান্নাবাড়ি খেলার বিশেষ অঙ্গ।

॥ ৩ ॥

মা চওড়া পাড়ের, শাদা খোলের শাড়ি পরতেন। খেলাচ্ছলেও তাঁকে আমি রঙীন শাড়ি পরতে দেখি নি। এই আটপৌরে কস্তাপাড় অথবা কখনো কল্কাপাড় শাড়িগুলি কিনে আনতেন বাবা, জোড়া জোড়া দেশী মিলের শাড়ি, আর নিজের জন্য থান ধুতি। নিজের শাড়ির পাড় প্রায়ই পছন্দ হতো না মায়ের, কী যেন অন্য পাড় দেখেছেন কোথায়, পাশের বাড়ির দিদি কি অমনি অন্য কোনো মহিলার পরনে—সেইরকম পেলে ভাল হয়। বাবা ফেরত দিয়ে নতুন পাড় আনতেন, না, তাও পছন্দ হতো না··· মা যা চাইতেন তেমন তো নয়ই, বাবা আগের বার যা এনেছিলেন তার চেয়েও ম্যাড়মেড়ে পাড়ের রং। ফিরিয়ে দিয়ে না হয় আবার আগের জোড়াই আনুন বাবা! আবার দোকানে যেতে হতো বাবাকে। এতবার ফিরেও কিন্তু বাবা কখনো বলতেন না যে তুমি চলো আমার সঙ্গে, কিংবা তুমি যাও দোকানে। না, সে রকম কোনো ব্যবস্থা সম্ভব ছিল না তখন, মায়ের পক্ষেও না, মেয়েদের পক্ষেও না। আমাদের জামাও কিনে আনতেন বাবা, নানারকম সৌখীন ছাঁদে তৈরী জামা। আমাদের বাড়িতে ইস্ত্রীর বন্দোবস্ত ছিল না, আর বাক্সের ভিতরে জামা ঠিক ভাঁজে রাখার ব্যাপারে মা আদৌ মন দিতেন না। দুমড়ে মুচড়ে সে সব বাহারে জামার শোভা অল্প কালের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যেত। মা বলতেন, দেখ দেখি, কী সব

কওমেনে জিনিস কিনে আনেন পছন্দ করে, একবার দুবারের বেশি পরানো যায় না ছেলেপিলেকে।

সে সময়ে দোকান পাটে মেয়েদের যাওয়ার এমন চল হয়নি বলে, এখানকার তুলনায় তখন বাড়ির দরজায় কাপড় ওয়ালাদের আবির্ভাব অনেক নিয়মিত ছিল। এদের ভিতরে শাড়ি ধুতি বিক্রেতা থেকে শুরু করে ছিট কাপড়, রেশমী কাপড়ের পসারীদেরও দেখা মিলত, শেষোক্ত দলে দেখা যেত চীনা ব্যবসায়ী। তাদের দেখলে বলতে হতো চীনেম্যান, চাং চুং। এই সব ভ্রাম্যমাণ শাড়ি কাপড় বিক্রেতাদের মা কখনো কখনো ডাকতেন, কিন্তু সে দৈবাৎ। যত ভাল শাড়িই তারা আনুক, দু দশটাকা একসঙ্গে খরচ করে ফেলার ব্যাপারে মায়ের খুব দ্বিধা ছিল। তিনি খরচ করতেন দেড়টা কি দুটো টাকা, কখনো বা বারো আনা পয়সা। হরেকরকম ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে কিনতেন খুঁটিনাটি এটা সেটা, সিঁদুর, ফিতে, কাঁটা। কাঁচের চুড়ি কখনো পরেন নি মা, কিন্তু মেয়েদের পরা মন্দ নয় বিবেচনায় ডেকে পরিয়ে দিতেন। বাড়ি থেকে বেরোনো মানে ছিল একটি বৃহৎ পর্ব। দুটি নাবালক সন্তান তো তাঁর সঙ্গে থাকবেই, আরো দুটিও সঙ্গ নিলে নিতে পারে। তাছাড়া তিনি বেরোলে পরে কে কখন ফিরবে। ফিরে কী খাবে, এসব সাজিয়ে না রেখে তাঁর বেরোনো হয় না। অথচ সে সব সাজাতে গোছাতে গেলে এত দেরি হয়ে যায় যে একে দুয়ে তারা সব ফিরতে সুরু করে। বেরোনোর ইচ্ছে তাই মা ফেরিওয়ালা ডেকে মেটাতেন। দরজায় দাঁড়িয়েই তাঁর বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যেত। এ বাবদে কেনা যত হোক না হোক, ফেরিওয়ালাদের ডাক শোনা যেত বারবার। বাবা বলতেন, তোদের বাড়িতে সব ফেরিওয়ালা আসে, একটাও বাদ পড়তে পায় না। মুশকিল আসান এসে মুশকিল আসান বেচে যায় তোদের মা-র

কাছে। —শুনে মা কখনো হাসতেন, কখনো একটু একটু চটতেন, কিন্তু কী ফেরিওয়ালা কী মুশকিল আসান কারো আসা যাওয়ায় কোন তারতম্য হতো না। .ফরিওয়ালাদের ডাক শুনে দিনের প্রহর ঠিক,করা যেত এমনি নিয়মিত ঘড়িধরা যাতায়াত ছিল তাদের। কাঁসারি যেত কাঁসিখানি বাজাতে বাজাতে তারপরে ডেকে যেত দাঁ ত ভা লো ক রি দাঁ তে র পো কা বা র ক রি, এর পরে ঘুঁটের রব শুনলে বোঝা যেত বিকেল হযে গেল। তিনটেয় কলের জল আসা ছিল আরেক ধ্রুব সংকেত। একটু বেলা না গড়িয়ে গেলে শিশু-চিত্তহারী লাঠির মাথায় মিষ্টি আঠার মতো জড়িয়ে থাকা কড়ি-কাঠটা, কাঁচের বাক্সে গোলাপী মিঠাই 'বুড়ির-মাথার পাকা-চুল' কিংবা কট কট খট খট বাজিয়ে যাওয়া ব্যাঙ কটকটি কাগজ ছাতিওয়ালার দেখা মিলত না

মা দুপুরে ঘুমোতেন না বিশেষ, কিছু না কিছু কাজে তাঁর সময় কাটত। শুধু অল্প একটখানি চোখ বুজে নিতেন তিনি বেলা দুটো থেকে তিনটের মধ্যে, সেই সময়টুকু ছিল আমার অখণ্ড স্বাধীনতার কাল। মা-বাবার জগতের মলকেন্দ্রের বাইরে, বাড়ির সামনের রাস্তার সীমা পেরিযে যে বৃহৎ সংসারের সাড়া আভাসে ইশারায় মিলত, সকাল বেলায় দাদাদের চেঁচিয়ে পড়া তৈরী করায়, মাথায় জল দিতে দিতে কলতলা থেকে বাবার ভাত— দাও বলে সাড়া নেওয়ায় ঠিকে ঝিয়ের বাজারের হিসেব মেলানোর চেষ্টায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ এই ছবি ও শব্দ জালগুলি সে সব আভাস ইশারাকে সম্পূর্ণ আবৃত করে রেখে দিত। বেলা বেড়ে গেলে, বাড়ির ভিতরের কলরব ঝিমিয়ে এলে, বিষণ্ণ দুপুরে পথের ডাক শোনা যেত পসারী পসারিনীর গলায়। সকাল বেলায় যে-জানলার ধারে দাঁড়ালে গোয়ালাকে দুধের বালতির ভিতরে খানিক খড আর ঘটি মগ ডুবিয়ে দুধ বিলি করতে দেখা যেত, সেখানে এখন ভিন্ন দৃশ্যের অবতারণা

হয়েছে। লাঠি হাতে গম্ভীরদর্শন কাবুলিওয়ালা পথ চলতে চলতে এদিকে এসেছিল কার খোঁজে কে জানে। তার চোখে চোখ পড়ে গেলে আমার ভয় করবে। তার চেয়েও বেশি ভয় করবে কোন বিকলাঙ্গ ভিখারীকে দেখতে পেলে। এই জানলায় আমি এক অন্ধকে দেখেছিলাম, সে বোধ করি কোনো আবেদন জানাচ্ছিল, কিছুতেই সরছিল না আমার দৃষ্টিপথ থেকে। আমি তখন মা-র কাছে উঠে গিয়েছিলাম, তাঁকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, অন্ধ হয়ে যায় কেন মা? লোকটা বলছে আমি অন্ধ? বিকেলে রাস্তা ঝাড়ুদারদের দেখতে পেলে হিসেব করতাম আলো জ্বালতে আসবে আর কতক্ষণ বাদে। রাস্তার ডুমো ডুমো গ্যাসের আলো দেখতে খুব ভাল লাগত আমার। সন্ধ্যের আলো জ্বলে গেলে আর ফেরিওয়ালারা ডাক দিত না। মোড়ের নাপিত তার বাক্স ডালা বন্ধ করে দিনের পাট উঠিয়ে চলে যেত!

বাড়ির ধোপা, নাপিত, সেকরা মোটামুটি বাঁধা থাকত তখন। এদের ভিতরে ধোপা এলে আমার সব চেয়ে ভাল লাগত! ধোপা-বাড়িতে দেবার জন্য যত ধুতি শাড়ি চাদর জড়ো করতেন মা, আমি তার থেকে তুলে নিয়ে নিয়ে যত ক'টা পারি গায়ে জড়িয়ে ফেলতাম, মোটাসোটা বড় মনে হতো নিজেকে, আর কোরা কাপড়ের গন্ধ পেলে তো খুশির মাত্রা থাকত না। ছাড়া কাপড় পরতে নেই বলে মা-র ধিক্কারকে একেবারে আমল দিতাম না। অন্য একটা ব্যাপারে অবশ্য তাঁর বাধা মানতেই হতো। ঐ যে কোরা কাপড় গায়ে জড়ালে আমার মনে হতো নাচবার সময় হয়েছে, আর নিজস্ব উচ্চারণে 'কে নিবি ফুল' গাইতে গাইতে ঘোরাঘুরি করে বেড়াতাম-ঐটির মাঝামাঝি এলেই মা খুব জোরালোভাবে বলে উঠতেন, চুপ, একদম চুপ। আমি 'আমার যৌবন বাগানে হাওয়া লেগেছে ফুল জাগানে' ছন্দের মাঝখানেই থেমে যেতাম। এর মধ্যে

বকে ওঠবার কী আছে বুঝতে না পেরেও মা-র অপ্রসন্নতার ভয়েই চুপ করে যেতাম তখন। ক্রমে অনুরূপ বকুনি খেতে কিছুদিন আমার প্রত্যয় জন্মেছিল ; প্রেম আর যৌবন এ দুটো খুব বিচ্ছিরি কথা। বিড়ি সিগারেট খাওয়া যেমন বিশ্রী, এ দুটো কথা মুখে বলাও বোধ হয় তাই।

আমাদের বাড়িতে সেকরা আসত মাঝে মধ্যে। বিয়েচুড়ো বা অমনি কোন উপলক্ষ্যে। ডিজাইনের বই নিয়ে সে বসত এসে বাইরের ঘরে আসর জমিয়ে, মা ভিতরে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলতেন। গহনা প্রস্তুত হলে নীল কাগজে মুড়ে সে-ই ফেরত এসে বুঝিয়ে দিয়ে যেত। যেমনটি করতে বলা হতো ঠিক তেমন হতো সব সময়ে, বিশেষ করে চুড়িতে এসাচড়ে প্যাটার্ন কিংবা কানের সবুজ টপ নিয়ে মাকে বেশ কয়েকবার বুঝিয়ে দিতে হয়েছে দেখেছি। ওই একটু আধটু শখ মায়ের তখনো ছিল। তাও সে গড়িয়ে রাখার জন্য, গহনা পরার ব্যাপারে তাঁর সংকোচ ছিল। যত্ন করে খোঁপা বাঁধতে কি আলতা পরতেও তাঁকে দেখিনি নিজে থেকে। আমাদের চুলের যত্ন নেবার জন্য তিনি বেশ করে আঁচড়ে টেনেটুনে বেঁধে দিতেন। চুলে টান লাগলে আমি চেঁচামেচি করতাম। চুল নিয়ে মায়ের সঙ্গে আমার গোল লেগেই থাকত। আর কিছু না হোক দ্বিতীয়বার মাথাটাকে কামিয়ে আমার চুলের প্রাচুর্যবিধানের একটা রীতিমত চেষ্টা করেছিলেন মা। নাপিত পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। আমি মাঝের ঘরের ইঁদুর এবং আরশোলাজনিত ভয় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেই ঘরে লুকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ, খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে আসার পরে এমন কাঁদনই কাঁদলাম যে সম্ভবত নাপিতেরও দয়া হলো। চুল শুধু ছেঁটে আমায় ছেড়ে দেওয়া হলো। মা বললেন, চুল হবে না মোটে দেখ, সেই আঠারো মাসের এক কামানো চুল হয় কখনো মাথায় ? —মা-র সৎ পরামর্শ মেনে সুফল ফলাবার সুমতি

আমার তখনো হয় নি। এর কারণ হিসেবে মা বলতেন, বাবাই আদর দিয়ে আমার মাথাটা খেয়ে ফেলেছেন।

বাবা কিন্তু তেমন কিছু আদর দিতেন না আমায়। তিনি দিতেন হলুদ, সবুজ, রাঙা নানা রং আর ছাঁদের লজেন্স—যাকে আমি তখনও লবঞ্চু বলে অভিহিত করতাম। তিনি অফিস থেকে ফেরার সময়ে জেগে বসে থাকলে আমি তাঁর হাত থেকে নিয়মিত এই লবঞ্চু মোড়ক পেতাম, আর পেতাম অনর্গল কথা বলে যাওয়ার সুযোগ। তার আগেই বাবা মারলেও কিছু করতে নেই ভুলে গিয়ে আমি ছোট ছোট দাঁত বসিয়ে বাবার হাঁটু কামড়ে দিয়েছি রেগে গিয়ে; বাবাকে তুমি বলতে নেই, আপনি বলতে হয় তা-ও মনে থাকে না আমার তখনো, কথা বলতে গেলে প্রায়ই আধ-আধ হয়ে যায়, তবু, আমারই অধিকার থাকে তাঁর হাঁটু ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আবোল-তাবোল বকে যাবার। —আহা, অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই। মানুষটাকে জুড়োতে দে আগে। —বলে মা আমাকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন কখনো কখনো। কিন্তু সে প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে পড়ে না। বাড়িতে বয়ঃ-কনিষ্ঠের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত ছুটির দিনে বাবা বেড়িয়ে ফিরলে তাঁর জোড়া পায়ের ওপরে "ঘুঘুসই"য়ের দোল খাওয়ার একচ্ছত্র অধিকারও ছিল আমার।

ছুটির দিনে বাবার কাজ ছিল অল ডে টিকিট কেটে এ পাড়া ও পড়ায় ছড়িয়ে থাকা আত্মীয় বন্ধুদের খবর নিয়ে আসা। স্বজনমহলে সদালাপী বলে খ্যাতি ছিল তাঁর। বরানগর, কালীঘাট এ সব মুলুকের নাম শুনতাম তাঁর কাছে, কবে একদিন ট্রামে চেপে আমিও যেতে পাব ঐ সব পাড়ায়--কল্পনা করতে ভাল লাগত আমার। হাঁটতেও বাবা খুব ভালবাসতেন। কাছাকাছি জায়গায় হেঁটে না গিয়ে ট্রামে বাসে ওঠাকে বেশ গর্হিত কাজ বলে গণ্য করতেন তিনি।

তাঁর বাল্যে যে হৃতমান জমিদার-বাড়ির নাট্যঘরে তাঁকে শেষ অংকের নায়ক হতে হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলেই সম্ভবত মদ্যজাতীয় পানীয় বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ অনমনীয় দৃঢ়তা ছিল। সিগারেট নয়, পান নয়, তিনি পান করতেন শুধু চা। পাছে তাঁর জন্য বারে বারে চা করতে গিয়ে ছুটির দিনে রান্নাঘরের অন্য কাজে বাধা ঘটে সেই ভয়ে তিনি একটি স্পিরিট ল্যাম্প রেখেছিলেন নিজের আয়ত্তে। দরকার মতো এক পেয়ালা চায়ের জল তাতেই গরম হয়ে যেত। ছুটির দিনে প্রায় অপরাহ্ণে নিজের মনে তৈরী চায়ে চুমুক দিতে দিতে তিনি খানিক পেসেন্স খেলে নিতেন। আমি দেখতে পেলেই আপন সুখদুঃখের কথা শুনিয়ে যেতাম তাঁকে। তার কতক তিনি শুনতে পেতেন, কতক পেতেন না। তাতে আমার কথা একটুও বাধা পেত না।

মামাবাড়িতে আমার মামা ছিলেন অনেক কজন। মা বলতেন, তাঁরা সবাই খুব কাজের লোক, কর্মনাশা তাস পাশা কিংবা দাবার সঙ্গে তাঁদের কারো কোন সংশ্রব ছিল না। এঁদের কেউ কেউ হঠাৎ আমাকে ডেকে 'অ মণি, আছ কেমন? আস দেখি কী লিখতিছ—' এই সব বলে উঠলেও এঁদের কাছে গিয়ে কখনো অনেক কথা বলে ফেলতে ইচ্ছে করে নি আমার। এঁদের ধরনে ধারণে বৈচিত্র্য ছিল। আমাদের বাড়িতে যে মামাকে নিত্যনিয়মিত দেখা যেত তিনি আমি এ সংসারে এসে উপস্থিত হওয়ার ঢের আগেই মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে গল্পগাছা করবার কোনো জো-ই ছিল না! তিনি আমাদের বাড়িতে এসে সোজা মায়ের রান্নাঘরের দালানের সামনে 'খাতি দে' বলে বসে যেতেন খেতে। মা যা কিছু দিতেন তরকারী পরোটা কিংবা দুখানা নিমকি একটু হালুয়া তার সবটাই একসঙ্গে মুখে পুরে গ্লাসের জল সবটা এক সঙ্গে খেয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। ফল সর্বদা সুখদায়ক হতো না।

মাঝে মাঝে তিনি কাগজ পেন্সিল চেয়ে নিয়ে চিঠি লিখতেন কাউকে। সে-সব চিঠি তিনি ইংরেজি লিখছেন ভেবেই লিখতেন। রোমান হরফগুলি ক্রমে এলিয়ে যেত হিজিবিজি অস্পষ্টতায়। তাঁকে দেখলেই আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করত। কিন্তু একা রেখে গেলে মা যদি মুশকিলে পড়ে যান তাই আমি একপাশে বসে বসে মা-কে পাহারা দিতাম। একদিন তিনি হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন, কী হইছে তোমার?—বলে উঠে এসে কপালে একবার হাত ছুঁইয়ে বলেছিলেন, সরোজ, তোর ম্যায়ের জ্বর।

মা কতকটা বিশ্বাস, খানিক অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না, আমিও তখন পুরো বুঝতে পারি নি, আমার সত্যি খুব জ্বর এসে গিয়েছিল। অথচ যে-মামা বাইরের জগৎ যেন দেখতেই পান না মনে হয়, তিনি কি করে বুঝলেন কেবল তাকিয়ে দেখেই? তবে বুঝি আসলে উনি বেশি বুঝতে পারেন? এই ঘটনার পরে এঁর বিষয়ে আমার কৌতূহল কিছু বেড়েছিল, ভয় কতকটা কমেছিল, কিন্তু তাতে আমাদের সম্পর্কে তারতম্য হয় নি।

মামাবাড়িতে নিজের মা আর দুটি মাতৃহীনা রূপসী কন্যার স্নেহে যত্নে অনেক সাংসারিক উদ্বেগ, অশান্তি সত্ত্বেও অন্যমনস্কভাবে হাত-পা মেলে থাকার তাঁর অবকাশ ছিল। তাঁর স্বাধীন পথ-পরিক্রমাও ছিল নির্বাধ। আত্মীয় আধবুড়ুনি বাচ্চারা বলত, এ ওকে ওষুধ খাইয়েছিল জানিস। চাকরাতে গিয়ে ঐরকম হয়েছিল।—তিনি ঘরে থাকলেও ওরা স্বচ্ছন্দে সদলবলে, সরবে 'এলাটিং বেলাটিং রাইলো' কিংবা 'আমপাতা জোড়া জোড়া' খেলতে পারত। আমি এমনিতেই দলবাঁধা খেলায় যোগ দিতে পারতাম না, ওখান থেকে তো কেবলই বাড়িতে ফিরে আসতে ইচ্ছে করত। ছোটমামার ডাক্তারি গবেষণার জন্য গিনিপিগগুলি জাল দেওয়া বাক্সে নড়ে চড়ে বেড়াত, আমি তাদের দেখতে দেখতে ভাবতাম বাবা কখন আসবেন

আমাদের নিয়ে যেতে। বাবা এলেই রায়মশায়, বসেন, বসেন,— বলে আপ্যায়ন করে মামা-মামীমারা বসিয়ে দিতেন তাঁকে। বাড়িতে ফিরে গিয়ে মামাবাড়িতে কী হলো না হলো বাবাকে বলার আগেই ঘুম এসে গেলে ভারি বঞ্চিত মনে হতো নিজেকে। অর্থাৎ, আমার বাবাকে বড্ডই ভালবাসতাম আমি।

॥ ৪ ॥

গান আর পড়া এই দুটি শখ ছিল বাবার। পড়ে আর পড়িয়েই কালপাত করবেন আশায় মাষ্টারী দিয়ে জীবন সুরু করেছিলেন একদা, বৃহৎ সংসারের চাপে সে সংকল্প রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

বাড়িতে খুব স্বল্পবাক্ মানুষ হিসেবে দেখা যেত তাকে, থাকতেন না তো বেশিক্ষণ তিনি বাড়িতে। সকালে একটুখানি দেখতে পেতাম তাঁকে, সন্ধ্যার পরে সময়মতো ফেরা সম্ভব হলে তখন আরও একটুক্ষণ। প্রায়ই সম্ভব হতো না তার পক্ষে সকাল সকাল ফেরা।

আমার ঘুম এসে যেত, হঠাৎ চমকে ঘুম ভেঙে টের পেতাম বাবা এসে গিয়েছেন, হয়ত নতুন কোন গান বাজাচ্ছেন কলের গানে, কিংবা নতুন গল্প বলছেন একটা। শুনতে পেলেই উঠে বসতাম। কোন কোনদিন ঘুম ভেঙে টের পেতাম আমার নামে নালিশ করা বাবার কাছে, কিংবা নালিশ করা যায় এমন কোন ঘটনার অবতারণা হচ্ছে আলোচনায়, আমি চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতাম, জেগে আছি দেখলে বাবা বকে দিলেও দিতে পারেন, নইলে-তো

নয়? নালিশের বিষয় ছিল প্রধানত দাদাদের সঙ্গে আমার রেষারেষিকে কেন্দ্র করে। দাদারা একে বয়সে বড়, তায়—মা বলতেন,—পুরুষ ছেলে, তাদের সর্বথা মান্য করা ছাড়া আমার আর কিছু করবার নেই। এ যদি আমি বাল্যে না শিখি তো কখন শিখব? বাবা এ নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইতেন না। কেবল তখন বলে নয়, পরেও। সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে তিনি যেন ঠিক মন স্থির করে উঠতে পারেন নি।

খুব ধীরে সুস্থে চলার মানুষ ছিলেন আমার বাবা। যেমন সুগঠিত ছিল তাঁর হস্তাক্ষর, তেমনি সুন্দর সাজানো জীবন তিনি গড়তে চেয়েছিলেন বোধ হয়। যতখানি অবসর পেলে সেদিনের পরিবর্তন-সম্ভাবী সমাজের সমস্যাগুলিকে সাজিয়ে সমস্ত উত্তর তিনি বের করে গুছিয়ে ফেলতে পারতেন, তেমন অবসর তাঁর ছিল না তো। অনেক প্রশ্নের সামনে তাই তিনি চুপ করে যেতে ভালবাসতেন। বয়সই কি যোগ্যতার শেষ বিচার? ছেলে আর মেয়ের ভিতরে মেয়েকে কি খাটো হয়ে থাকতেই হবে? এসব ছিল সেই জাতের প্রশ্ন।

ত্রিশের দেশাত্মবোধ অনেক বাড়িতে চরকা সুতো এ সব এনে দিয়েছিল বটে. কিন্তু সে চক্রের চৌহদ্দি অনেক বাড়িতেই ছিল প্রধানত চার দেয়ালের ভিতরেই। মেয়েদের পড়ানোর রেওয়াজ বেশ কিছুদিন যাবত চালু হয়েছিল। আইনের আশীর্বাদে গৌরীদানের বিধি বন্দ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষিত মানুষের মন মেয়ে সন্তানের শিক্ষার দিকে যেতে সুরু করেছিল তবু সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে দোনামনা ভাব ঘোচেনি। পাশ করা মেয়ে, বে-পর্দা মেয়ে একই কালে সম্মান এবং ব্যঙ্গের উদ্রেক করত। পর্দানসীনতাও তেমনি একই সঙ্গে সম্ভ্রম এবং বোকামির লক্ষণ বলে গণ্য হতো। বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে এর মূল্য একেবারে আড়াআড়ি হয়ে

মাঝখানে অনেক আত্মীয় গৃহিণী উপস্থিত থেকে পক্ষাবলম্বন করে ফেললেই ব্যাপারটা জটিল হয়ে যেত। এর পরে 'আমি এর মধ্যে নেই তোমরা যে ভাবে প্রাণ চায় তেমনি করে লোক হাসাও বলে বাবার বাড়ি থেকে সাময়িক নিষ্ক্রমণ আর মামীমাদের কাছে মায়ের 'কাছে মায়ের খেদ। এ সমস্ত জটিলতা থেকে সরে এসে আমি নতুন বাড়ির অন্ধি-সন্ধি খুঁজে দেখতে দেখতে এসে পড়েছিলাম বারান্দার ছোট কলটার কাছে। নিচের কল বন্ধ করে দিলে ওপরের এ কলে প্রথমে একটা হিশ হিশ শব্দ হয়। তার পরে ক্ষীণ ধারায় জলও পড়ে। তারই একপাশে দেখলাম কে গাদা করে রেখে গেছে গঙ্গামাটি। অনুষ্ঠানে কলাগাছ পোঁতার পরেও উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে যে মাটি তাই কে রেখে গেছে এখানে। দেখেই আমার দুপুরের কার্যবিধি স্থির হয়ে গেল। সারা সকাল ব্যস্ততার পরে, সকলে যেই দুপুরে গা গড়িয়ে নিতে গেছে, আমি চলে এসেছি গঙ্গামাটি দিয়ে দুর্গাঠাকুর তৈরির দুরূহ কাজে।

বসে বসে সরু সরু হাত গড়া হলো, পা গড়া হলো চ্যাপটামতো একখানি মুণ্ডু-ও গড়লাম। তারপর আয়তক্ষেত্রের মতো মাটির অবয়ব গড়ে তাতে যথাস্থানে হাত পা মাথা বসিয়ে জুড়ে দিয়ে যতবার দাঁড় করতে যাই, আমার সাধের দশভূজা মূর্তি ততবার ভেঙে ভেঙে পড়ে। এতে শক্কান্ত অধ্যাবসায়ে ছেদ দিতে পারলাম না। এর ভিতরে যে বেলা ফুরিয়ে আসছে, উৎসব বাড়ি জেগে উঠবে, নতুন করে লোক আসতে সুরু করবে. এ সব কিছুই আর আমার মনে নেই। প্রজাপতি ব্রহ্মার মতো স্বীয় সৃষ্টিতে আমি তখন মগ্ন। বাবা দেখতে পেলে বলতেন, এ দেখ পাগলী মেয়ে কী করে বসে আছে কাদা টাদা মেখে। কিন্তু আমার মা-দুর্গার উত্থান-পতনের রোমহর্ষক পর্ব ওরকম স্নেহের শাসনে শেষ হবার নয়। তাই বাবা না দেখতে পেয়ে আমাকে দেখতে পেলেন মা।

চারটে বেজে গিয়েছে দেখে মা এসে কখন আমায় এখানে আবিষ্কার করেছেন এবং সবলে আমার কান ধরে ফেলেছেন আমি টেরই পাইনি প্রথমে। আমার ছোটমাপের নখগুলির ভিতরে কাদা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, নাকে মুখে এবং মাথার চুলেও হয়ত কিছু কিছু কাদা লেগে থাকবে। বাড়িভরা অতিথি সজ্জনের মাঝখানে আমার এই কিম্ভূত সৃজনশীলতায় মা বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন। দেবী দুর্গাকে আদৌ চিনবার চেষ্টা না করেই হাত-পা-মাথা-মুখের সেই স্বর্গীয় সমাহার দলা পাকিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন গঙ্গামাটির স্তূপে। দুটো চারটে কিল পড়েছিল আমার পিঠে। চাপা গলায় অবিশ্রান্ত আক্ষেপ করে যখন তিনি আমাকে ভদ্রমতো ধুয়ে মুছে তুললেন তখন বৌদিদির মামাবাড়ির আত্মীয়জন এসে গেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে-র "নেচেছে প্রলয়নাচে" গানখানি চেপেছে কলের গানে। সে গানের সঙ্গে প্রবল পদদাপে নেচে যাচ্ছেন বৌদিদির এক মামাতো বোন। মা দুর্গাকে খাড়া করতে না পারার দুঃখ এর পরে ভুলে যেতে আমার বিলম্ব হলো না। হাসি চাপতে চাপতে আমি সে প্রলয় নাচ দেখতে লাগলাম। স্টেজের বাইরে কাউকে নাচতে দেখলে কেন আমার হাসি পেত যে তখন!

এ সব লোমহর্ষক কাণ্ডে এ অন্নপ্রাশন পর্ব শেষ না হলেও এ অনুষ্ঠান আমার মনে থাকত। আমার শৈশবের প্রান্তদেশে পৌঁছে ভারিক্কি চোখে এই যে নতুন শিশুকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম এতে আমার পর্যবেক্ষণ শক্তি খুব বেড়ে গিয়েছিল। বাড়িতে একটি শিশুর আবির্ভাব কি সহজ ঘটনা! কেউ ছিল না যেখানে, সেখানে এসে গেল একটুখানি ছোট মাপের মানুষের মতো, অথচ মানুষ ঠিক নয়, বাচ্চা। তখন আবার বাচ্চা বলার রীতি শুরু হয় নি। আমাদের বাড়িতে তো নয়ই. কোথাও নয়। ক্রমে যখন এল কথাটা, মা বলতে লাগলেন, বাচ্চা হওয়া আবার কি রকম

কথা? জীবজন্তু নাকি? ছেলে হওয়া কি সন্তান হওয়া বলতে হয়।

আঁতুড় ঘরের বন্দোবস্ত আমাদের বাড়িতে খুব বিধান-সম্মত ছিল তখন, যে-কেউ সেখানে ঢুকে পড়বে, তার জো-টি ছিল না। বাইরে সকলে উদ্বিগ্ন অপেক্ষায়। আমরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভিতর থেকে ধাত্রী বেরিয়ে এসে ঘোষণা করলেন, ছেলে হয়েছে, শাঁখ বেজে উঠল সশব্দে, বাবা গ্রামোফোনে একখানা গানের রেকর্ড চাপিয়ে দিলেন। মেয়ে ডাক্তার তখনো দেখা দেয় নি। কিন্তু পাশ-করা ধাত্রী—হ্যাঁ, তা চলতো। এর পরে ষষ্ঠির নানা হিসেবে খেপে খেপে পূজো, আট দিনের দিন আট কড়াই, পাট কড়াই, ছেলে আছে ভাল—বলে ধামা পেটানো আর খই বিলোনো, হিজড়েদের নাচ গান, লোকজনের আসা যাওয়া হালসী বাগানের গলির বাড়ির শেষ ক'টি দিন ভরে রেখেছিল। আমি হয়ত এর ভেতরে সম্পূর্ণ আত্মহারা, নিমজ্জিত হয়ে যেতাম (কতটুকু আত্মাই বা আমার ছিল তখন?) যদি না বাচ্চার জন্মের অল্পকাল আগে ভূমিকম্পের একটা খুব ক্ষণস্থায়ী কিন্তু দীর্ঘ ছায়াপাতী অভিজ্ঞতা আমাকে স্পর্শ করে যেত।

॥ ৭ ॥

ভূমিকম্প হয়েছিল উত্তর বিহারে—প্রধানত,—কিন্তু কলকাতাও কেঁপেছিল অল্প নয়। আমি মেঝেয় বসে কোনো একটা আপন মনের খেলায় মগ্ন, মা দিদিকে নিয়ে মেঝেতে মাদুর পেতে গা এলিয়েছেন, একটু আগেও তিনি আমার কথায় সায় দিয়েছেন। বৌদি তাঁর নিজের ঘরে দুপুরের বিশ্রাম নিচ্ছেন, এমন সময়ে আমার হঠাৎ মনে হলো, মেঝে আপন মনে কেঁপে কেঁপে উঠছে, দেয়ালের দিকে চেয়ে দেখি আমাদের মৃত দিদির ছবি এমন করে দুলছে, যেন এখনি পড়ে যাবে। আমি হাত বাড়িয়ে মাকে নাড়া দিয়ে বললাম, ও মা। ছবিটা নাচছে কেন ?

মা-র সামান্য তন্দ্রা এসেছিল। চমকে উঠে বললেন। ওরে ভূমিকম্প হচ্ছে তো ! 'ওঠ, ওঠ বৌমা, অ বৌমা, বাইরে চল বাইরে, শীগ্‌গির।

মা সত্বর আমাদের নিয়ে পথের ধারে খোলাজমিতে এসে দাঁড়ালেন। প্রতিবেশী আরো কেউ কেউ এলেন সেখানে। শাঁখ বাজতে লাগল ঘনঘন, নারায়ণের নাম স্মরণ করা হলো বারংবার। আমার জানাই ছিল বাসুকি পাশ ফিরলে ভূমিকম্প হয়। পাশ ফিরলে নয়, মাথা নাড়লে—কে যেন সংশোধন করে দেন, সমস্ত জগৎটা ওনার মাথায় রয়েছে তো, মাঝে মাঝে নড়ে চড়ে নেন। কিন্তু শাঁখের শব্দে কি কোলাহলে বাসুকি কেন তাঁর পার্শ্ব পরিবর্তন কিংবা শির সঞ্চালন স্থগিত

রাখবেন? ওসব করতে যতটা সময় তাঁর লাগায় তা তো লাগবেই। সেই অবসরে জমি বিদীর্ণ হবে না কি? সত্যি? প্রশ্নটা বুঝে নেওয়ার জন্য আমার বাবার কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল। সেই একই সঙ্গে পাতাল দেশটা দেখবার জন্য উৎসুক হয়েছিলাম বড্ড। জমি ফাঁক হওয়ার আশায় পায়ের দিকে চেয়ে রইলাম আমি। বড্ড আশা ছিল—সীতাদেবীর সিংহাসন না হোক কোন একটা আশ্চর্য জগৎ সে ফাঁকে দেখে নেওয়া যাবে। সে আশায় চেয়ে থাকতে থাকতে আমি বাবার কথা ভুলে গেলাম, মা-র কথাও। নিজে আমি কোন নাগরাজ্যে গিয়ে পৌঁছব,—এই মোহন কল্পনা অধিকার করে রইল আমাকে। অল্পক্ষণের এই মগ্নতা।

তারপরেই হঠাৎ টের পেলাম মা আমার বাহুমূল আকর্ষণ করে আমাকে বাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। সকলেই ফিরে যাচ্ছে যে যার কাজে। মাটি ফাটেনি, কোনো অদৃষ্টপূর্ব বাড়িঘর, বন, পথ, নদী কিংবা পর্বত প্রেক্ষাগোচর হয় নি। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার মতো আমাকে হতাশ নিরানন্দ রেখে মাটির কাঁপন থেমে গেছে। মাটির তলা তা হলে আর আমার দেখা হবে না বুঝি? কী যে মন বিশ্রী রকম খারাপ হয়ে গেল আমার। অথচ আমার মাকে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দেখলাম এ ব্যাপারে।

সময়মতো দাদারা, বাবা নিজের নিজের স্কুল, অফিস, কাছারী থেকে ফিরে এলেন। কাঁপনের সময় কে কোথায় ছিলেন, কী করে প্রথম টের পাওয়া গেল, এসব কথা ফুরোলে বড়রা সকলে পাটনা আর মজঃফরপুরে কী হয়েছে অথবা হতে পারে এ নিয়ে ভাবনা করতে লাগলেন। কেননা শোনা যাচ্ছিল সেখানকার অবস্থা সাংঘাতিক। সেই ভাঙচুরের মাঝখানে আছেন মামা, আছেন বৌদিদিরও এক নিকট আত্মীয়, এমনি আরো অনেক আত্মীয়স্বজন, যাঁদের নিয়ে বড়দের ভাবনা হবেই। তারা রক্ষা পেল কি না, কেমন

করে অবিলম্বে তাদের খবর আনা যায়,—এ নিয়ে সকলে আলোচনা করতে লাগলেন। এমন কি, তার ক দিন পরে গান্ধীজী যেন এ ভূমিকম্প নিয়ে কী বলেছেন কোথায়, এসব কথাও শোনা যেতে লাগল। কিন্তু মাটির তলা নিয়ে কোনো আগ্রহ, পাতাল দর্শন বঞ্চিতের কোনো হতাশা কিছুই দেখালেন না কেউ একদিনও। সেই প্রথম, খুব ঝাপসাভাবে, আমার নিজেকে বাড়িভর্তি লোকের ভিতরে একা মনে হলো। মনে হলো, আমি যা ভাবছি, তা তো এঁরা কেউ ভাবেন না? আমি যা বলতে চাই তা বলেন না, কথাবার্তা সব অন্যদিকে চলে যায়। নিজে মন মতো কথা চালাবার জন্য আপনমনে নিজের দুটি বুড়ো আঙুলকে বাবা-মা বা অমনি আর কেউ সাজিয়ে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হওয়ার ঝোঁক এর পরে আমার বেশ বেড়ে গেল।

এ জন্য কিছু নিভৃত সময় আমাকে রাখতেই হতো। দু একদিন আমি ঘরের ভিতরে খুব মাথা মুখ নেড়ে গল্প করছি, দাদা আর দিদি হঠাৎ ঘরে ঢুকে—ও কিরে, কার সঙ্গে কথা বলছিসরে—বলে যা কাণ্ড বাধিয়েছিল। এসব আকস্মিক প্রতিক্রিয়া দেখে আমার আর বুঝতে বাকি ছিল না যে আর কেউ দেখে ফেললে অবস্থাটা সুখের থাকবে না, বিশেষ করে, মার কানে কথাটা উঠলেই তো হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্যটা কী সেটা মনে মনে মাকে বোঝাবার জন্যেও আমাকে একা একা লুকোনো জায়গা খুঁজতে হতো। সকল সময় জনসমক্ষে থাকা তাই আমার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। বাচ্চাকে দেখবার জন্যও না। ওকে দেখতে যে আমার বড্ডই আগ্রহ ছিল এতে অবশ্য ভুল নেই, বড় দাদাকে ভয় করে যে এতকাল এড়িয়ে চলেছি, তাও যেন পাল্টে যাওয়ার জো হলো। সময় পেলেই চলে যেতাম দেখতে কেমন করে বাচ্চা হাত পা নেড়ে খেলা করে নিজের সঙ্গে নিজে, কী করে উপুড় হয়ে যায়, ক্রমে ক্রমে

কত কী পারে। অনেকগুলো নাম হয়ে গেল ওর কাকাদের দৌলতে। এমন কি দাদা—যার হাফ-প্যান্ট-পরা কোলে ও যাবে না বলে আমি এ-মা এ-মা করি—সেও নিজে নিজে ওকে আলাদা নামে ডেকে ফেলল : গজো।

॥ ৮ ॥

এর আগে আমার জগতে প্রধানত ছিল মৃতের অধিকার। বিশেষ করে ছোড়দিদির, যাঁর ছবির তলে মা লিখে রেখেছিলেন :

জরাব্যাধি হিংসাপাপ যে দেশেতে নাই,
হাসিমুখে শান্তি সুখে থেক সেই ঠাঁই।

যাঁর জন্মের কাহিনী একবারও শুনি নি, কিন্তু মৃত্যুকাহিনী শুনেছি ফিরে ফিরে নানা ভাষ্যে, আমার বাল্য চিন্তা সেই ছোড়দিদির কল্পনায় অনেকখানি ভরে ছিল।

অথচ মা মাঝে মাঝে আমাকে বড়দিদির দ্বিতীয় জন্ম বলে চিহ্নিত করেছেন। মা নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি এসেছেন ফের ছেলেমানুষ হয়ে মার সামনে, রংটি ময়লা হয়ে গেছে। বড় শান্ত ছিল তো সে। আমি তাই বলেছিলাম, আবার যদি আস তেজ নিয়ে এস।

এ সব শুনেও আমার মন বড়দিদির চিন্তায় তেমন রে ধাবিত হয় নি। তাঁরও ছবি ছিল বাড়িতে। সন্তান কোলে, স্বামীর মহিমময় উপস্থিতিতে জড়ো সড়ো, চুল খোলা বালিকার প্রাক্‌বিবাহ আলোকচিত্র—এরকম বেশ কয়েকখানি ছবির কথা মনে পড়ছে।

বর্ণনায় যেমন শুনেছি ছবিতেও তেমনি তাঁকে ধীর, স্থির, শোভনতার প্রতিমূর্তি বলে মনে হতো। তিনি যে দশ বছর বয়সে চব্বিশ পেরিয়ে যাওয়া স্বামীর হাত ধরে শ্বশুরঘর করতে চলে গিয়েছিলেন, অল্পকাল পরেই মৃতবৎসা নাম সংগ্রহ করে, বাৎসরিক ব্যর্থশ্রমে ক্লান্ত হয়ে রক্তাল্পতা রোগে ইহধাম ছেড়ে চলে যান—এতে তাঁর সম্বন্ধে সবই যেন বলা হয়ে গিয়েছে মনে হতো। সন্তান ধারণে তাঁর অধ্যবসায়ের চিহ্ন-স্বরূপ দুটি শিশুকে অবশ্য তিনি রেখে যেতে পেরেছিলেন। একটি তাঁর দেহত্যাগের পরেই তাঁকে অনুগমন করে। অন্যটিকে আমরা প্রায়ই ধারে কাছে পেতাম, মায়ের মা-মরা নাতনী হিসেবে তার সঙ্গে খুব সন্তর্পণে ব্যবহার করতে হতো।

ছোড়দিদি এ রকম কোনো চিহ্ন রেখে যান নি। তাঁর স্মৃতির মধ্যে ছিল একখানি মোটা দিস্তে কাগজের খাতা, যাতে হাতের লেখা থেকে সুরু করে শ্যামাসঙ্গীতও লেখা ছিল। আর ছিল তাঁর পুতুলখেলার বাক্স, চুল বাঁধার ফিতে, কাঁটা, কাপড়ে আঁটার পিন। জরাব্যাধি হিংসা পাপহীন ঠাঁই কি কোথাও আছে? ছোড়দিদি কি সেখানে পৌঁছতে পেরেছিলেন? কেউ জানে না। কিন্তু তাঁকে সে সন্ধানে যেতে হয়েছিল এ সংসারের হিংসা পাপের তাড়নায়। সতীলক্ষ্মীর আদর্শ মনে যে পরিমাণ উজ্জ্বল থাকলে শ্বশুর বাড়িতে পিষে ফেলবার চেষ্টাকে সহাস্যে সয়ে থাকা যায়, কোন রকম প্রতিবাদ করবার প্রবৃত্তিমাত্র হয় না, তাতে কিছু আত্মসম্মানজ্ঞানের খাদ মিশে গিয়েছিল কেমন করে কে জানে, ছোড়দিদিকে তাই স্বেচ্ছায় সরে যেতে হলো সংসার থেকে—কিছু অসময়ে কিন্তু মেয়েদের আর সময় অসময় কী—মানে মানে গেলেই হলো, তবে জেদ করে যাওয়াটা ঠিক নয়। মা বলতেন, মেয়েমানুষের জেদ ভাল নয়—বলতেন, আর তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ত। কত যে কাঁদতেন আমার মা আপন মনে একা বসে কিংবা হাতে মাথা দিয়ে

কান্ত হয়ে শুয়ে, যখন তাঁর হাতে একটুখানি অবসর, যখন দুপুর নির্জন। আমি খুব ছোটবেলায় তাঁর সে কান্না থামাতে গিয়ে বড় বিব্রত করতাম তাঁকে। আমি যতই আমার অপটু হাতে তাঁর চোখের জল মুছে দিতাম, তাঁর কান্না ততই বেড়ে বেড়ে যেত।

ছোড়দিদির জেদের এই করুণ প্রকাশ বিষয়ে বাবা কখনো একটি কথা বলেন নি। শুধু দেখে শুনে মনে হতো, মেয়েদের জেদকে তিনি ভয় করতে শিখেছিলেন। জেদের উত্তর জেদ দিয়েই দেবেন এই সর্বনাশা প্রস্তুতি তাঁর মনে আর অবশিষ্ট ছিল না। যে রকম সুখদুঃখে সময় কাটুক, শ্বশুর বাড়িতে মেয়েকে ফিরতেই হবে বলে হুকুমজারি করে বাবা অফিসে চলে গিয়েছিলেন, ফিরে আসতে হবে সে মেয়ের আক্ষরিক পোড়া মুখ দেখতে,—এমনটা তিনি ভাবেন নি। অত্যন্ত চিন্তার প্রতায়ে তাঁকে গুরুতর রকম রাগিয়ে দিতে পারত মেয়েদের ওপরে, পারল না, কেন না অপত্যস্নেহ বাবার মনে গভীর ছিল। বাবা মনে মনে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে কন্যাসন্তান বিষয়ে সাবধান হতে সুরু করলেন। বিয়ের আগে মেয়েদের মত নেওয়ার চল হলো। বিয়ের বয়স সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হলো। এসব ফল একে একে ফলে উঠেছিল। এ নিয়ে কোন সভাসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এমনও নয়, কথাচ্ছলে হঠাৎ উঠে যেত এসব কথা। ছোড়দিদির মৃত্যুতে মা শারীরিক ভাবে আহত হয়েছিলেন, বাবার আঘাত ছিল মনে। অনেক ঢাকতে হয়েছিল বাবাকে। ইচ্ছামৃত্যুকে দুর্ঘটনার কাহিনীর আবরণ পরাতে হয়েছিল। শোক এবং অগ্নি-সন্তপ্ত মায়ের কোন বঞ্চিত কনিষ্ঠতম সন্তানকে দেখাশোনা করতে হয়েছিল মাসের পর মাস। হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে তিনি তাকে মৃত মেয়ের নাম ধরে ডেকে উঠতেন, আমি অনেকটা বড় হওয়ার পরেও তাঁর মুখে শুনেছি সে ডাক। ডেকেই তিনি বলতেন, আরে কি বলি,—আর

আমার মনে হতো, আমি যদি ঠিক সেই ছোড়দিদি হয়ে যেতাম, কী খুশি হতেন আমার বাবা। আমি ছোড়দিদি হয়ে গেলে আবার মোটে আমি থাকবই না ভাবতে একটু বাধত না তাও নয়। ছোড়দিদিকে ফিরিয়ে আনার অনেক পরিকল্পনা ছিল আমার বাল্যে। তার কোনো একটি কাজে লাগাতে পারলে যে সবচেয়ে ভাল হতো, এতে কোন সন্দেহ নেই।

বাড়িতে বাচ্চা আসার পরেও ছোড়দিদির ফেলে যাওয়া পুতুলদের নিয়ে আমার আর দিদির মধ্যে কাড়াকাড়ি হয়ে গেল। কিন্তু অতীত আর মৃতদের নিয়ে ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভবিষ্যতের চিন্তা জুড়ে দিলাম এইবারে। যখন সত্যি করে বড় হয়ে যাব তখন বাচ্চা আমায় পিসি বলে ডাকবে কি? আমার ভাবনার শুরু ছিল এখানে। এরই সূত্র ধরে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আমার কল্পনা ছড়িয়ে যেত কতদিকে। মৃতদের ফিরিয়ে আনতে যাওয়ার দৌড়ে আমি যতদূর না যেতে পেরেছি, প্রাণবন্ত জগতের নিত্য পরিবর্তনের প্রশ্নে আমার মন চলে গিয়েছে তার চেয়ে বহুদূরে, অনেক গভীরে।

॥ ৯ ॥

হালসী বাগানের প্রাণবন্ত জগতের অন্যতম অধিবাসী ছিল নেংটি ইঁদুরের পাল। মধুর অভাবে যেমন গুড় দিয়ে কাজ চালাতে হয়, পক্ষিরাজ ঘোড়া, কিংবা পোষা বাঘ, সিংহের অপ্রতুল থাকায় আমার ইঁদুর দিয়েই কল্পনার কাজ চলত। এর একটা মস্ত সুবিধে ছিল এই যে এ জন্য আমাকে কারো সাহায্য চাইতে হতো-না একটুও। ইঁদুররা নিজেরা নিজেদের দেখাশুনোর বন্দোবস্ত করে নিত। ওদের ছুটোছুটি করে বেড়াতে দেখলে দারুণ উত্তেজনা হতো আমার, ওদের

সঙ্গে কোথায় না কোথায় গিয়ে যে মনে মনে লুকিয়ে পড়েছি তার ঠিকানাই মেলে না। ওদের অবশ্য তাতে কিছু এসে যেত না। দিদি আমায় শিখিয়ে দিয়েছিল 'ইঁদুর আমার দাঁত নিয়ে যা তোর দাঁত দিয়ে যা'. বলে গর্ত খুঁজে খুঁজে দাঁত ফেলতে। কত দাঁত ফেলেছি এমন তবু তাদের মন পাইনি। তাদের ভিতরে কোনো একজনই একবারই কেবল আমার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। এ জন্য আমাকে রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে বসতে হয়েছিল। অন্ধকারে পায়ের বুড়ো আঙুলে যেখানটাতে জ্বালা করছে সেখানে এত জল লেগে আছে কেন জানবার জন্য মাকে ডেকে তুলেছিলাম। বাবা তাঁর বিছানা থেকে উঠে এসে আলো জ্বালিয়ে ছিলেন। কে যেন ভয় পেয়েছিলেন বিষাক্ত কিছু কামড়াল কি না ভেবে। মা বলেছিলেন, ইঁদুর। এত রক্ত বেরোয় কখনো নইলে? কচি আঙুল কতখানি কেটে নিয়েছে দেখ।

ইঁদুর প্রকৃতির এই অসৌজন্য আমার জানা ছিল না এর আগে, এখন জেনেও এই দুষ্ট দংশক ইঁদুরটিকে খুঁজে বের করবার একটা সংকল্প নেওয়া ছাড়া ইঁদুরজাতি বিষয়ে আমার মনোভাবের কোন তারতম্য ঘটেনি। কিন্তু আতাবাগানে আসার পরে তাদের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ বিরল হয়ে এল। আতাবাগানে আমায় বিরক্ত করবার জন্য অনেক আরশোলা ছিল কিন্তু ইঁদুর দেখা যেত না। তা সত্ত্বেও আমার মনের ভিতরে তাদের জন্য যে একটি স্থান ছিল, তা আমি বুঝতে পারতাম। ইস্কুলে ঢুকে ইঁদুর-সিংহের গল্প আমার অত ভাল লেগেছিল সেত ঐ জন্যেই। অন্য কোন জন্তু তাদের বৃহৎ আকার কিংবা চতুরালি দেখিয়ে সে স্থান নেবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। ছিলই না অন্য জীবজন্তু আশে পাশে! চিড়িয়াখানায় যাওয়ার সুযোগ আমাদের কম ছিল, দু একবার যা গেছি আমার ভাল লাগেনি সে যাওয়া।

হালসী বাগানের বাড়ি থেকে বড় দাদা আমাদের একদিন সার্কাস দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন সেখানে মনুষ্যেতর প্রাণী সম্বন্ধে যতখানি হৃতশ্রদ্ধা দেখানো সম্ভব আমি তাই দেখিয়েছিলাম। খেলা আরম্ভ হওয়ার অল্প পরেই আমার মনে হলো জল চাই। —আর সার্কাস দেখে কে! জল খাব না? বাঃ!

সার্কাসের কাছাকাছি কোথাও পানীয় জল সংগ্রহ করা যেত না তা নিশ্চয়ই সত্যি নয়. বড় দাদা সম্ভবত স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে সেদিকে যান নি। তিনি খুব সহৃদয় ভাবে আমাকে কমলালেবু এনে দিলেন একটা। বললেন, এটা খা। তেষ্টা চলে যাবে।

আমি সেটা সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলে বললাম, জল খাব।

আসলে আমি যেটা জানতাম না, সেইজন্যে জানাতেও পারিনি তখনো কাউকে, সেটা হলো এই যে আমার সহজাত দূরদৃষ্টির অভাব রয়েছে। স্টেজের ওপরে জীবজন্তুর মতিগতি কিছুই আমি ধরতে পারি না। জীবজন্তুর মুখ, চোখ, দাঁত, এসব দেখতে না পেলে সার্কাস দেখায় মজা থাকে না। আর, তাছাড়া সব বাচ্চারই চিড়িয়াখানা কি সার্কাস ভালো লাগবেই এমন কোন কথা নেই। আমাকে একা একা আপনমনে যতবার ইচ্ছে রাস্তা পারাপার করতে দিলে আমি খুশি হতাম ঢের বেশি।

আতাবাগানের বাড়ির সামনের রাস্তাটি ছিল অনেকটা চওড়া, দরজায় দাঁড়ালে এদিকে ওদিকে কিছু বাড়ি চোখে পড়ত। সব ক'টিই ভদ্রচেহারার, অর্থাৎ, মধ্যবিত্ত মানুষের বাড়ির মতো চেহারা। এঁরা বিকেলে কি সন্ধ্যেবেলায় তাঁদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য ডাকাডাকি করলে মা ঘুরে আমার অনুমতি দিতেন। কিন্তু আমি সে অনুমতি সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইনি কোনদিন। দিদি গেলে সঙ্গে সঙ্গে এর-ওর-তার বাড়িতে যেতাম কখনো কখনো, কিন্তু ছাদের ওপরে সেই দল বেঁধে খেলা আমার ভালো লাগত না।

কাছাকাছি কোন এক চণ্ডীবাড়িতে সন্ধ্যাকালে পুজো হতো, খানিকক্ষণ তার ঘণ্টা শোনা যেত। আমি বাড়িতে বসে মনে মনে কল্পনা করতে ভালবাসতাম পুজোটা কেমন হচ্ছে, কত ধূপ না জানি ছড়াল, দেখতে যাওয়ার জন্যে একেবারে অস্থির ছিলাম না। আমার কেবল সারা দুপুর বড্ড ইচ্ছে করত সামনের রাস্তাটুকু পার হয়ে মোড়ের ডাক বাক্সটাকে ছুঁয়ে আসতে। এ ইচ্ছেকে সত্যি পূরণ করে নিলে কী হতো কে জানে। করিনি বলেই এ ইচ্ছের রং একটুও ম্লান হয়নি কখনো। ডাক বাক্স আর ডাক হরকরা আমার মন হরণ করে রেখেছিল +

অনেক বেশি খাবার ফিরি হতো এ রাস্তায়; কুলপি বরফ মালাই বরফ, আলু পাঁঠার ঘুগনি, আইস্ কিরিম সন্দেশ। দাঁত ভালো করি-র ডাক ক্রমে ক্রমে ম্রিয়মাণ হয়ে এল, খাবার পসারীদের মাহাত্ম্য অনুভব করতে শিখলাম,—আর কোন ডাকে কী আর এসে যায়?

সত্যি কি তাই? না তা বোধ হয় নয়। পসারীদের ডাক ছাড়াও আর একটি ভারি ভিন্ন রকমের সাড়া এসে পৌঁছল আমার কাছে আতাবাগানের বাড়িতে, যার সুর কানে শোনা যায় না, ভিতরে টান দেয়। তার আকর্ষণ ভরা থাকে ছাপার অক্ষরের পৃষ্ঠায়, শব্দে আর ছবিতে। বই আমাকে নতুন জগতে নিয়ে যেতে পারে এ কথা জানার রোমাঞ্চ আমি সেই প্রথম অনুভব করেছি। বাবার বইয়ের তাকগুলি আমায় দিনরাত্রি টানছিল।

কিন্তু বড় উঁচু সে সব তাক। হাত পৌঁছতে চায় না, মোড়া কিংবা জল চৌকি গুছিয়ে এনে তাতে উঠতে হয়। ধরা পড়ে গেলে মা-র বকুনি খাবার ভয় থাকে। আমি বরং হাতের কাছে যা মেলে, দাদাদের পড়তে পড়তে রেখে যাওয়া বই, মা-র নিচু পুজোর তাকটিতে রাখা গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, রামায়ণ, মহাভারত, আর ভীষণ

নতুন বাঁধাই শ্রীমা-কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃত নিয়ে ব্যস্ত থাকাই বিধেয় মেনেছি।

দাদাদের স্কুলপাঠ্য বই ছিল ইংরেজি, শুধু সাহিত্য সুধা জাতীয় বাংলা সাহিত্যের বই ছিল এর ব্যতিক্রম। দিদি ইস্কুলে ভর্তি হলে দিদির পাঠ্য বইয়ের বাংলা চেহারা দেখে স্কুল বিষয়ে আমার আগ্রহ বেড়ে গেল। বৌদিদি এরই কাছাকাছি সময় দিয়ে পিত্রালয়ে যাওয়ায় আমার হাতে চলে এসেছিল তাঁর ঘরে সাজিয়ে রাখা উপহারের বই। এর ভিতরে ছিল চয়নিকা, গোরা, লীলাকমল, আর সৌরীন্দ্রমোহনের গুটিকতক প্রণয়াত্মক উপন্যাস। কারো কোন প্ররোচনার অপেক্ষা না রেখেই চয়নিকা হয়ে উঠল আমার সবচেয়ে পছন্দের বই। 'মর্মে যবে মত্ত আশা সর্প সম ফোঁসে' আওড়াতে আওড়াতে আমি বালি ভরা ছাদে খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। যতদিন না স্কুলে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছি. এই নানা দরের. ভিন্ন স্তরের বইগুলি আমাকে ব্যাপৃত রেখেছিল। আমার বইয়ে আগ্রহ আর যত্ন দেখে মা আমার আয়ত্তগম্য করে দিলেন তাঁর তুলে রাখা ধন সম্পদ। আমার দাদারা স্কুলে বাংলা বই পুরস্কার সংগ্রহ করছিলেন বছর বছর, সেগুলি এখন হয়ে উঠল আমার চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়। এতদিন দাদার সঙ্গে আমার কাড়াকাড়ি ছিল মা-র কাছে প্রথম আমসত্ত্বের টুকরো পাওয়া নিয়ে, কিংবা বাবার পাতের পাশে রেখে যাওয়া সেই বিশেষ দইয়ের খুরির জন্যে। এখন গল্পের বই কে কখন কোনটা পড়বে এ নিয়ে সুরু হলো রেষারেষি। আর সেই সঙ্গে বেড়ে গেল আমাদের নিজেদের ভিতরে গল্প করার বিষয়।

এর আগে দাদা এসে মাকে ইস্কুলের গল্প বলতেন যখন, আমি দাদাদের ইস্কুলের ভিতরটা মনে মনে দেখতে পেতাম। খুব সুন্দর গল্প বলার ধরন ছিল দাদার। তাদের নীলরতন স্যার, খুব কড়া

অথচ কী ভালবাসেন ছাত্রদের ; আর সেই যে মা ইস্কুলের বড় উৎসবে থিয়েটার করতে মানা করেছেন, স্যার যখন বললেন আমি বলছি তুই করবি আর তুই বলছিস মা বারণ করেছেন ? কার কথাটা বড় ? দাদা অমনি বলেছেন মা-র কথা বড়, আর স্যার খুব খুশি হয়ে গিয়েছেন। এ সব গল্প যেমন করে বলতেন দাদা, তেমনি জীবন্ত করেই বলে দিতেন শরৎচন্দ্রের বর্মা প্রবাসের গল্প ঠিক যখন আমি নিষ্কৃতি কিংবা মেজদিদি শেষ করেছি। এই সময়ে আমার পড়া হয়ে গেল বাংলা অনুবাদে টলস্টয়ের গল্প : মানুষ বাঁচে কিসে।

॥ ১০ ॥

পড়তে পড়তে আমার সাধ এসেছিল লেখার। ছাপার অক্ষরে লেখা দেখে দেখে আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। আমি যেখানে যেমন ফেলে দেওয়া কাগজের টুকরো পাই, লিখে ফেলি কিছু না কিছু। বাবা আপিসে যাওয়ার আগে তাঁর হাতে গুঁজে দিই ছাপিয়ে এনে দেওয়ার জন্য। বাবা মাথা নেড়ে সেগুলি নিয়ে যান, কিন্তু তারপরে তারা নিখোঁজ হয়ে যায়। এই নিপুণ জঞ্জাল সরানোর ব্যাপারে বাবাকে আমি সাহায্য করি নি, তা নয়। লেখাগুলি দেবার বেলায় নিয়ে যেতে হবে বলে যেমন করে ঝোলাঝুলি করেছি, ফেরত এল না কেন বলে তার সিকিভাগও চাপ দিই নি কখন। বাবা তাই বিনা চেষ্টাতে আমার লজ্জিত বাল্যকে লোক চক্ষুর আড়াল করতে পেরেছেন। তা ছাড়া, বাড়ির লোকদের লেখার বাতিক সামলানো বাবার অভ্যাস ছিল। নিজে অবশ্য তিনি চিঠিপত্র লেখাকেই

আত্মপ্রকাশের অদ্বিতীয় পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু মা ছোট ছোট কবিতা লিখতেন। বড় বড় কবিতা লিখতেন গোয়াড়ীর জ্যেঠিমা, কলকাতায় এলেই পড়ে শোনাতেন তিনি। ছোড়দাদা বড় হয়ে যা লেখালেখি করছিলেন নাটক কি গানের জন্য এ খবর বাবা নিশ্চয় রাখতেন। তবে দাদা যে কবিতা লেখেন কখনো কখনো তা তিনি তখনো জানতেন কি না বলা শক্ত। যাই হোক, আমার এ সব উদ্যম তাঁকে নূতনত্বের জোরে মোহিত করতে পারে নি মোটেই। এমনি করে কিছুকাল চলবার পরে আমার দিদি একদিন চার লাইনের কবিতা লিখে আমার এ সমস্ত রচনাকে একেবারে হতমান করে দিল। দাদা তবু বেশ কতখানি বড় আমার চেয়ে; ছন্দ টন্দ মেলায়, মেলাতেও পারে। দিদিও সেই কঠিন সাধনার অংশীদার হতে পারে আমি জানতাম না। 'সুখী হও, সুখী হও, হে দুঃখী ভদ্রা' পড়ে আমি স্থির করে ফেললাম, কবিতা লিখতে শেখার আগে টুকরো কাগজে লেখা আর নয়।

এ রকম শপথবাক্য উচ্চারণের পরেও লেখা আমার বন্ধ হয় নি, হাতের লেখার মোটা খাতার এ পাশে ও-পাশে আমি নিতান্ত বিশ্রী অভ্যাসের বশে আপন মনে কত কী যে লিখে ফেলেছি হিসেব নেই। তার আয়োজন যেমন, উপকরণও তেমনি কিছুই ছিল না। আমার অভিজ্ঞতা-কালে তো বটেই, স্থানের হিসেবেও নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কলকাতার বাইরে বেথুয়াডহরি ছুঁয়ে গ্রামে গেছি দুই-একবার। সেখানকার নদী, মাঠ, কলেভাণ্ডির বাগান, সিদ্ধেশ্বরীতলা দেখেছি কি দেখি নি, ফিরে এসেছি কলকাতায়। এর বেশি দূর পাল্লায় যেতে গেছি এক বহরমপুরে। কিন্তু দেখা হয়েছে আমার যা একটু ঐ কলকাতাকেই। আর কলকাতার সূক্ষ্ম জটিল জীবন তখন আমার কাছে না-চেনা দাবার ছকের মতো। ছোট একটি বারান্দা কিংবা ছাদে বসে আমি বৃষ্টির ছাঁট গায়ে নিয়ে অবুঝের মতো

খুশি হয়ে যেতে পারি, কিন্তু সে খুশিকে ধরে দিই কী করে। তবু আমি লিখি কেবল লিখে যেতে ভাল লাগে বলেই। ফেলে দেব জেনেও আঁকা বাঁকা অক্ষরে লিখে যাই। মা টের পেলে হাতের লেখার খাতা বাজে বাজে নষ্ট করছি বলে খুব শাসন করবেন জানি। কিন্তু একে বাড়িতে বাচ্চা, তার উপরে আতাবাগানে এসে মামাবাড়ি ছাড়াও অন্য এক আত্মীয়-গোষ্ঠির ঘনিষ্ঠতর সান্নিধ্য মিলে গেছে। এঁদের নিয়ে মা-র সময় ভরে থাকায় আমার একা লেখার অবসর মিলছিল বেশি।

এর মাঝখানে আবার হঠাৎ মা-র সাবিত্রী পাহাড় তীর্থে যাওয়ার যোগ পড়ে গেল। প্রভাত দাদা বদলী হয়েছেন আজমীরে, বলতে এসেছেন, মাসিমা তোমাদের কাছ থেকে দূরে যাচ্ছি এবার।—আর অমনি মা হাতের খুন্তি নামিয়ে রেখে বলে উঠেছেন, ও প্রভাত, আমায় তুই নিয়ে চল। আমি একটু পুকুরের জল মাথায় দিয়ে আসি।

প্রভাতদাদা হচ্ছেন আমাদের বড়দাদা-ছোড়দাদারও বড়দা, কাজেই তিনি মা-কে তীর্থ করাতে নিয়ে যাবেন এতে তার কথা কী! আমি তক্ষুনি মা-র আঁচল ধরে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে গেলাম। শুকনো খেজুর কাঁটার গাছ আর পাহাড়ের মুল্লুক আজমীরে শীত-শীত সকালে চেনা হলো আমার টঙ্গা, এক্কা, ধর্মশালা, প্যাঁড়া আর পাণ্ডাদের সঙ্গে। দিদি কলকাতায় জ্বর বাধিয়ে মা-র তীর্থ বাসে ছেদ এনে না দিলে পাহাড়ী মানুষদেরও হয়ত দেখা হতো আমার কিছু। সাবিত্রী পাহাড়ে ওঠানামার হাঙ্গামা আমার পক্ষে কিছু বেশি ছিল। যদিও পাণ্ডাজীর কাঁধ, ঠোঙাভর্তি জিলিপি এ সব ব্যাপারটাকে সহজ করে এনেছিল, তবু পাহাড়ে উঠে মন্দির দেখার চেয়ে পাহাড় নিয়ে লোক-কাহিনী যে আমার মনে ধরেছিল ঢের বেশি তার প্রমাণ রইল কলকাতায় ফিরে পাহাড়ে জঙ্গলের পট-

ভূমিতে রাজকন্যা চম্পাকে নিয়ে আমার প্রথম প্রমাণ সাইজ গল্পে। সে গল্পের কথা যিনি মুখে মুখে কথাচ্ছলে শুনেছিলেন, তিনি এসে পৌঁছলেন আমাদের আজমীর থেকে ফেরার কিছুকাল পরে।

ছোড়দাদার বিয়ের জন্য যত সম্ভব অসম্ভব পাত্রীর খবর এসেছিল, তার পরের সব দাদাদের বেলায় সে রকম কিছুই হয়নি। দূর আত্মীয়, অনাত্মীয় কত মানুষ যে এসে এসে তুলে ফেলতেন কথা। এখন ছোড়দাদার বিয়ে দেবেন না বাবা? তৈরি ছেলে তো, ডাক্তারী পাস হয়ে গেছে? তা দু চারমাস দেরি হয় হোক, মেয়ে দেখে রাখুন। কেউ কেউ ছবি হাতে নিয়েই আসতেন। বাবা আবার মেয়ে দেখে দেখে বেড়ানো পছন্দ করেন না জেনে অনেকে দিস্তে দিস্তে চিঠি পাঠাতে লাগলেন। কত সুন্দরী বউ চাই বাবার? শিক্ষাও তো দেখবেন? এই দেখুন এ মেয়ে কী সুন্দর মাই ডিয়ার ফাদার বলে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে চিঠি লিখেছে তার বাপকে। খুব সুন্দর মেয়ে অবশ্য নয়, তা বদ্যির ঘরে খুব সুন্দর কটা? —এই সব যুক্তি শুনতে শুনতে ঘটকালি ব্যাপারটা খুব জানা হয়ে যাচ্ছিল আমার। দেনা পাওনার ব্যাপারটা অবশ্য বেশি শোনা যায়নি কেননা ও কথা তুলতে এলে বাবা বিষম বিরক্ত হয়ে উঠতেন। ছেলের বিয়েতে কিছু নেবেন না বলে একেবারে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন তিনি।

শোনা যাচ্ছিল ছোড়দাদা 'বিয়ে করব না' 'বিয়ে করব না' করছেন, ও রকম নাকি তখনকার স্বদেশীয়ানার হিড়িকে না কিসে অনেকে করতো। সে কথা শুনে বিয়ের চেষ্টা থামিয়ে দিত না কেউ কোথাও, আমাদের বাড়িতেও থামল না।

আতাবাগান পাড়ায় আমাদের যে আত্মীয়গুলি কাছাকাছি এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন কতকটা নতুন ধরনের মানুষ। বাবার শৈবালিনী মাসীমা দুর্ঘটনায় এক চোখ হারিয়েছিলেন, অন্য চোখেও

কম দেখতেন, কিন্তু তাতে তাঁর সেই প্রাচীন বয়সেও রূপ কিংবা মহিমা এতটুকু কমে নি। এঁর মেয়ে ইতি পিসী যেন বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠা থেকে নেমে এসেছিলেন। অল্প বয়সে বিধবা, লেখাপড়া শিখে এখন সরকারী শিক্ষা বিভাগে কাজ করছিলেন তিনি। একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। —দাঁড়িয়ে গেছে —শৈবালিনী মাসীমা বলতেন। ইস্কুলের কাজে আছেন এরকম দু চারজন বিধবা কি স্বামীপরিত্যক্তা মহিলা আত্মীয় মহলে ততোদিনে আমি দেখেছি। কিন্তু তাঁরা কেউ ইতিপিসী নন। ইনি এসে অক্লেশে বাবার সঙ্গে লীগ অফ্‌ নেশনস-এর ব্যর্থতার কথা বলেন, আর নিমকি বেলে দেন মাকে। মেয়েকে যে পিসী 'ফুরফুরি' বলে ডাকেন তা শুনেও আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। একসঙ্গেই আসেন বাবার এই মাসীমার পুত্রবধূ, মাথায় অল্প কাপড় ছুঁইয়ে সকলের সামনে বসেন, কথা বলেন। রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী বউ, বাড়িতে থেকে এম. এ. পাস দিয়েছেন। কলকাতার বাইরে ছিলেন এঁরা। ইদানীং বাবার মেসোমশায়ের কার্যকাল শেষ হয়ে যাওয়াতে এদিকে ডেরা নিয়েছেন। ছেলেরা ফিরে যাবেন ফের পশ্চিমে।

এঁরা দিলেন উর্মেরিয়ার মেয়ের খবর 'এই আমার বউ যা দেখছিস, এর চেয়েও সুন্দরী মেয়ে। ঘর আলো হয়ে যাবে তোর।' —দক্ষিণ কলকাতায় সে মেয়ের আত্মীয়দের নিবাস। সেখান থেকে নিয়মমাফিক কেউ এলেন প্রস্তাব তুলতে। দেখতে দেখতে বিয়ের দিন ধার্য হয়ে গেল। খুব উত্তেজনায় আমি একটা কবিতা পর্যন্ত মিলিয়ে লিখে ফেললাম। সে কবিতার খবর অবশ্য দিদি ছাড়া কেউ জানতে পারে নি। এই উমেরিয়ার মেয়ে রাজকন্যা চম্পার গল্পটা মুখে মুখে শুনেছিলেন এসে আমার কাছে।

॥ ১১ ॥

এরই ভিতরে বাড়ির বড়দের মতে আমার ইস্কুলে যাবার সময় হলো। ভর্তি হতে গেলাম আমি দিদি যে ইস্কুলে যেত সেই বীণাপাণি পর্দা হাই-এ, কিন্তু দিদির সঙ্গে গেলাম না সেদিন। ভেবেছিলাম বাবা নিয়ে যাবেন আমায়, কিন্তু তিনি অন্যান্য দিনের মতোই সকাল সকাল ডিম-আলুসিদ্ধ ভাতেভাত খেয়ে নিয়ে শেষ পাতে দই ঢেলে নিয়ে খুরিটি আমার জন্য রেখে উঠে চলে গেলেন তাঁর প্রাত্যহিক কর্মের ধান্দায়। মা বললেন, তুই ওই পাতে খেয়ে নে। দই চাটিসনে এখন। আজ তোমায় সুধীরদাদা এসে নিয়ে যাবে দেখ। ইস্কুলে যেতে হবে যে'।

শুনে আমার সকাল পালটে গিয়ে কী যে হয়ে গেল! আমি তক্ষুনি একা একা গিয়ে আপনমনে কথা বলে এলাম খানিকটা। যে সব কথা ইস্কুলে গিয়ে বলব। কিংবা ফিরে এসে বলব বাবাকে। সুধীরদা কাজ করতেন ইনশিওরেন্সে। খুব বলতে কইতে পারতেন। তিনি আমায় ভর্তি করাতে নিয়ে গেলেন ক্লাস থ্রীতে; আমায় পরীক্ষা করবার জন্য দিদিমণি ঝুলপর্দা লাগানো দরজার আড়ালে নিয়ে গেলেন। প্রশ্ন করা হলো, পঁচিশটা আম পাঁচজন ছেলেকে দিলে কে ক'টা পাবে বল দেখি?

আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। গরমকালে যেমন মা আম কিনে মেঝেয় ছড়িয়ে দেন একধারে, তেমনি আমি দেখতে পেলাম পঁচিশটা আম ছড়ানো। একটা ছেলে এসে খাচ্ছে তো খাচ্ছেই!

সে একাই যদি সব ক'টা খেয়ে ফেলে, বাকি সবাই কাড়াকাড়ি করে কে কতটুকু কেড়ে নিতে পারবে কে জানে?—আমার চিন্তাশীল নীরবতায় বিরক্ত হয়ে দিদিমণি আরো দু চারটে নামতা, যোগ বিয়োগ শুধিয়ে কাগজে কী সব লিখে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন বড়দিদিমণির ঘরে। সুধীরদাদা সেখানে বড় দিদিমণির মুখোমুখি বসে কী সব বোঝাচ্ছিলেন। খুব মোটাসোটা, ফর্সা টে বড়দিদি-মণির ভাবগতিক দেখে আমার রোগা, কালো মুখ নিশ্চয়ই খুব শুকিয়ে উঠেছিল কেননা আমি দেখলাম সুধীরদাদা একটুক্ষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে নিলেন। আমার পরীক্ষাদাত্রীটি বড় দিদিমণির হাতে তাঁর মতামত লেখা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কাগজখানি উল্টেপাল্টে দেখে বড়দিদিমণি বীণাপাণিনিন্দিত স্বরে বললেন, টু-তে নিচ্ছি একে। থ্রী-তে পারবে না। বুদ্ধির অঙ্ক পারছে না তো।

শুনে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল, টু-তে যেতে হবে বলে নয়, বুদ্ধির অঙ্ক না পারার খবরে। আমার বাবা বুদ্ধি আর গৌরবর্ণকে খুব মূল্যবান মনে করতেন। একটা লোক দারুণ বুদ্ধিমান আর একেবারে টকটকে ফর্সা—ব্যাস, এরপরে আর কথা নেই। আমি বাবার কালো মেয়ে বলে এত কথা ইতিমধ্যে শুনে ফেলেছি যে তার তো হিসেবই নেই। কিন্তু বুদ্ধি? ইস্, বুদ্ধির অঙ্কে আমি বরবাদ হয়ে গেলাম!—ভেবে সেই ছোট বয়সে যতদূর আত্মগ্লানি সম্ভব আমি অনুভব করলাম বড়দিদিমণির ঘরে বসে।

ভর্তি অবশ্য আমাকে ক্লাস থ্রী-তেই করা হলো। কেননা সুধীরদাদা এমন রকম-বেরকম যুক্তি জাল বানাতে লাগলেন, বড় দিদিমণিকে ক্লান্ত দেখাতে লাগল। এরপর যখন পর্যায়ক্রমে সমস্ত দাদাদের অসামান্য ধীশক্তি, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয় পাঠকালীন কীর্তিসমূহের কথা উল্লেখ করে আঙুল নেড়ে সুধীরদাদা বললেন,

এ মেয়ে যদি ফার্স্ট না হয় এ পরীক্ষায় তো আমি এসে নামিয়ে দেব একে এক ক্লাস দেখবেন,— বড়দিদিমণি আমাকে থ্রী-তেই নিয়ে নিলেন।

আমি সুধীরদাদার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে সেখানেই দুপুরটা কাটালাম। খুব হাসি-খুশি ছিলেন সুধীরদাদার দরুণ আমাদের বৌদিদি। কুচোমাছের আর অম্বল কী সুন্দর রাঁধতেন তিনি, আর আমাকে ডাকতেন নেংটি ননদ বলে। আমার আর দিদির পুতুলের একবার মোটে বিয়ে হয়েছিল, সে বিয়েতে তিনিই ছিলেন একমাত্র সজ্জন নিমন্ত্রিত যিনি পয়সা পয়সা রসমুণ্ডি একেবারে দু'টাকার নিয়ে গিয়েছিলেন পুতুলদের জন্য। সেদিন তিনি বড়ি দিচ্ছিলেন বসে বসে। তাঁর হাতের কাজ শেষ হলো, সুধীরদাদাও দুপুরের ঘুম ঘুমিয়ে নিয়ে কাজে বেরিয়ে গেলেন। আমি বৌদিদির সঙ্গে বাড়িতে ফিরে এলাম।

স্কুলে যাতায়াত সুরু হলো। যদিও ইস্কুলে যাব বলে খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলাম কিন্তু সকালে উঠেই খেয়ে দেয়ে স্কুলে যেতে বিশ্রী লাগত আমার। হাঁটতে হাঁটতে আমার পেটের ভিতরে ব্যথা করত, থেমে যেতে ইচ্ছে করত, পিছিয়ে পড়তাম প্রায়ই দল থেকে, কিরণ রাগ করত দিদি বলত অপ্রস্তুত হয়ে—কী হয়েছে তোর ?—স্কুলে ঘণ্টাটি পড়লেই লাইন করে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কী একটা সমবেত গান,—সে ছিল এক শাস্তি। আর এক শাস্তি ছিল ড্রিলের ক্লাস। ঊষাদিদি আমাদের দল বেঁধে দাঁড় করিতে বলতেন, পা তোল ফেল এক দুই, এক দুই, এক দুই, এগিয়ে চল, এক দুই। এই মেয়ে, এক দুই। আমি সামান্য চেষ্টার পরে হাঁপিয়ে পড়তাম। ডাইনে চল বললে চট করে মোড় নিতে পারতাম না। কতক্ষণে ঊষাদিদি বলবেন, যা মেয়ে, এক দুই—এই আশায় কোনমতে ডান পা বাঁ পা টেনে টেনে চলতাম। ড্রিলের মাঝখানেই মাঝে মাঝে

উষাদিদি আমাকে এই মেয়ে এই মেয়ে বলে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ছেড়ে দিতেন, বলতেন, যা বোস গে এখন।

অন্য অনেকগুলি ক্লাস নিতেন তিনি। সে সব পড়ার কাজে তাঁর মন জয় করেছিলাম বলে তিনি বকতেন না আমাকে বেশি. এতে অন্য অপারগ মেয়েরা উষাদিকে পক্ষপাতের দায়ে দোষী করত। পড়তে আমার কেন যেন বড্ড ভাল লাগত, কিন্তু আনমন হওয়ার অভ্যাস তাতে চলে যায়নি একেবারেই। ক্লাসের ফাঁকে আমি খোলা দরজা কি জানলা দিয়ে বাইরের খোলা উঠোনটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সেখানে জলের ট্যাঙ্কের মতো দেখতে কিছু একটা ছিল যার উপরে শালিক, চড়াই, কাক এসে ভিড় জমাত দুপুরে। রোদ পড়ে যেত আস্তে আস্তে। ইস্কুলে বসে আমি এমনি কত বা দেখি. কিন্তু বাড়িতে এসেই আমি পড়ার বইয়ের যতটা পারি তাড়াতাড়ি পড়ে ফেলি। এতে মাঝখান থেকে সুধীরদাদার মুখ রক্ষা হয়ে গেল। আমি ইস্কুলে ভর্তি হবার পরেই বই পড়ার বদ অভ্যাসকেই বোধ হয় আমার সহপাঠিনী দিদিমণির মেয়েদেরও পিছনে ফেলে ক্লাসে প্রথম হয়ে বসলাম। এরকম অশোভন কাণ্ড আমি পরে আর কখন করি নি। কিন্তু তখন এর ফলে আমার ঘরে বাইরে এমন হঠাৎ মান বেড়ে গেল যে আমি নিজেকে খুব একটা বড় মাপে দেখতে শিখে ফেললাম। দিদিমণিরা ডেকে পাঠাচ্ছেন, উঁচু ক্লাসের মেয়েরা বলছে, বাড়িতে কেউ দেখিয়ে দেয় না? মাষ্টার রাখিস না? তবে কী করে করবী ছুনুকে হারিয়ে দিলি।

আমার মা অবশ্য ভ্রূক্ষেপ করেন নি এ সবে একেবারেই। মেয়েদের আসল পরীক্ষা যে জগৎ-সংসারে অন্যত্র, স্কুলের পরীক্ষায় ও সব কিস্তিমাৎ যে কিছু নয়, এ বিষয়ে তাঁর মত সাধারণভাবে খুব অনমনীয় ছিল। ভূয়োভূয়ি ওসব। ওতে কী হয়? কিন্তু মা একা

লেখাপড়া নিয়ে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টাকে ধিক্কার দিলে কোনো ফল হতো কিনা বলা যায় না। মনে হয়, নানারকম পারিপার্শ্বিক যোগসাজসে ব্যাঘাত না নিজেকে কেবল প্রথম সারিতে দেখার বদ অভ্যাস একটা মুশকিল হয়ে থাকত আমার জীবনে। কিন্তু তা থাকল না। আমারও বিদ্যাশিক্ষার কাল এল আর পারিবারিক কারণে আমাদের নড়াচড়া বেড়ে গেল বড্ডই বেশি।

এর ফাঁকে আমার ইস্কুলের রকম সকমে কতকটা অভ্যাস হয়ে আসছিল। কোন এক ঘুগনীওয়ালার কাছ থেকে দল বেঁধে ঘুগনী কিনে খেয়ে নিয়মভঙ্গ করেছে বলে দিদিদের ক্লাস সুদ্ধ মেয়েকে যেদিন কদমতলায় খাওয়া ঘুগনীর পাতাটি হাতে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো, সেদিন বড়দিদিমণির বজ্রকণ্ঠ থেমে যাবার পরেই আমরা উঁকি-ঝুঁকি মেরে জল খেতে যাচ্ছি ভাব দেখিয়ে, কদমতলাতে দিদিদের দুর্দশা দেখে এলাম বেশ শান্তভাবেই। বাড়িয়ে গিয়ে বলেও ফেললাম না কাউকে। মোহিনী সেনগুপ্ত গান শেখাবার ক্লাসে 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে' কিংবা 'মাধবী রাতে মম মন বিতানে' খুব উঁচু গ্রামে শেখাতে থাকলে গলায় সুর না তুলে শুধু মুখ নেড়ে যাওয়াও রপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু ড্রিল ক্লাস আমাকে তখনো সমানে ভয় দেখায়। বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে 'মার্চ মার্চ অল টোগেদার' বলে মস্ত এক দল মেয়ের সঙ্গে ঝাঁপ দেওয়ানোর একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে উষাদি আমায় ছেড়ে দিলেন।

এরকম দল ছুট কাণ্ড করে বেড়ালেও ক্লাসের সমবয়সী মেয়েরা কেউ কেউ ভাব করতে চাইত আমার সঙ্গে। যদিও তেমন বন্ধু কাউকে পাই নি—রাস্তার পাগলী তাড়া করলে কিরণের সঙ্গ ছেড়ে দৌড়-দৌড়-রাস্তা পাড়ের গল্প যাকে বলব মন খুলে, কিন্তু ফ্রক পরলে বেশি মজা না শাড়ি পরলে এ নিয়ে মতামত বিনিময়ের মতো সঙ্গিনী জুটে গিয়েছিল আমার। কালো রং কী করে ফর্সা করা যায় এ

বিষয়েও তাদের অনেক পরামর্শ ছিল। দুর্গা নামে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে এতটাই অন্তরঙ্গ হয়ে গেল যে তার প্রভাবে আমি হলুদ রংয়ের জামা কাপড় পরার রুচি তৈরিই করে ফেললাম। আমাদের ক্লাসে সমবয়সী মেয়ের তুলনায় আমার অসমবয়সী মেয়ে ছিল কিছু বেশি। তারা মেয়েদের সকলকে শাড়ি পরতে উপদেশ দিত। অসভ্য ছেলেদের কীভাবে চটি দেখানো যায় তার দৃষ্টান্ত দিত। দিদিমণিদের গোপন সুখদুঃখের কাহিনী বলত, (যূথিকাদি কেন কাঁদছিলেন জানিস? ওনার ডাইভোর্স হয়ে গেছে। বোকা, জানিস না উনি খ্রীষ্টান? খ্রীষ্টানরা বিয়ে করে আর ডাইভোর্স করে।) আর হোমটাস্ক লিখিয়ে দিত। এদের মধ্যমণি হিসেবে জুটি ছিল রেণুকা কল্পনারা। আচমকা আমি তাদের রাগিয়ে দিয়েছিলাম। কল্পনাকে ভুল সুরে 'ভাঙল মিলন মেলা গাইতে শুনে আমি যেই বলেছি এরকম সুর তো নয়', অমনি বেধে গেল গোল।— ওসব আবার কী কথা, ভারি যেন অঙ্ক পেয়েছে, গানের আবার ঠিক ভুল কি? তুমি গাও দিকি একটা গান, আমিও বলব ভুল সুর!

স্কুলে এর পরে আমি যতদিন ছিলাম, ততদিন যা করতে গিয়েছি তার ভিতরেও গণ্ডগোল তৈরি করে তোলা তাদের অন্যতম ব্যসনে দাঁড়িয়েছিল হীরা ও লালের কথা পড়ে আমি দিদির সাহায্যে তা থেকে একটা নাটক খাড়া করেছিলাম। ইস্কুলে দুর্গা, অশোকা, মাধবীদের জড়ো করে সেটা ছুটির আগের দিন অভিনয় করবার জন্য উদ্যোগও করেছিলাম। খুব গোপন রাখা ছিল ব্যাপারটা; ঠিক শেষদিন ক্লাসে সবাইকে চমকে দেওয়া হবে এই বোধ হয় উদ্দেশ্য ছিল আমাদের। কেউ রিহার্সেলে আসত না। টিফিনে বসে বসে একা একাই সকলের পার্ট মুখস্থ করে আমি স্থির করেছিলাম থিয়েটারটা হবে। দুর্গাও খুব তৈরি করেছিল ওর ভূমিকা। কিন্তু সেটা ছিল ছাগলওয়ালার ছোট ভূমিকা। অভিনয়ের

দিন তো ছুটির আগের দিনের হৈ চৈ! ক্লাস সাজানো হচ্ছে, সবাই ঘুরছে, শুধু আমাদের নায়ক-নায়িকাদের দেখতে পাচ্ছি না। এর ভিতরে দেখি যে—ছুটি দিদিমণির কন্যা প্রতিযোগিতায় আমার কাছে পরাভূত হয়ে কতকটা ক্ষুব্ধ, তাঁদের একজন এসেছেন দেখতে আমাদের নাটক। খুব বিপন্নভাবে আমাকে তখন নায়ক-নায়িকার খোঁজে যেতে হলো। গিয়ে দেখি বড় মেয়েরা তাদের দারুণ সাজিয়ে দিয়েছে, কিন্তু পার্ট একেবারে মুখস্থ না থাকায় তারা কেবলই ঘামছে আর বলছে, ও ঘরে যাব না। রেণুকা কোথা থেকে একখানা হিন্দুস্থানী উপকথা সংগ্রহ করে এনেছে। আমাকে দেখতে পাওয়া মাত্র হীরা ও লালের কথার পৃষ্ঠা খুলে এমন স্বরে তা থেকে পড়ে শোনাতে লাগল যেন এই গল্পটা নাটক করে আমরা খুব নিন্দনীয় ব্যাপার করেছি, নাট্যরূপ দেওয়ার মতো লজ্জার কাজ যেন নেই। সত্যি সত্যি আমার করতেও লাগল কান ঝাঁ-ঝাঁ, আমি বারবার বলতে লাগলাম, এই রেণুকা দিয়ে দাও বইটা আমাকে, এই রেণুকা কী হচ্ছে।—এতে আমাদের মনোবলের অভাব নিশ্চয়ই খুব ধরা যাচ্ছিল। এর পরে কল্পনা আর বাকি কয়েকজন মিলে নায়ক-নায়িকাকে ঠেলেঠুলে বেঞ্চি জোড়া দেওয়া রঙ্গমঞ্চে তুলে দিয়ে 'এই যে ওদের বিয়ে হবে' বলে যখন শাঁখ উলু শব্দের নকল করতে লাগল ধিক্কারে আমার সহযোগীরা মাথা নিচু করে ফ্রকের কোনা দিয়ে চোখ মুছতে লাগল। উপস্থিত দিদিমণি সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না দিয়ে 'কী পাকা মেয়ে সব'—বলতে বলতে বিরক্তভাবে উঠে চলে গেলেন।

দুর্গা আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, রেণুকা কল্পনার গায়ে আমি জলবিছুটি লাগিয়ে দেব।—স্কুলে জলবিছুটির চারা আছে জেনে খুব ভাবনা হলো আমার।

॥ ১২ ॥

সবে যখন আমার চেনা জানা জগতের সীমা এমনি একটু একটু করে বেড়ে যেতে সুরু করেছে, খুব অল্পদিনের ব্যবধানে আমাদের ছোট বাড়িতে নতুন আনন্দ আর নতুন শোক পর পর দেখা দিয়ে গেল। প্রথমে পাল্টাল আমাদের কলকাতার বাসা, তারপরে উঠল কলকাতার বাস।

আতাবাগান ছেড়ে কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের বাড়িতে বাবা-মা এলেন যাতে নতুন বউয়ের জায়গা সঙ্কুলান হতে একটুও বাধা না পড়ে। সমস্ত গায়ে ফুলের অলঙ্কার নিয়ে রাঙা রাজকন্যার মতো রূপসী নববধূ বসলেন এসে পুরোনো চালের ঘরখানিতে, উৎসবের আসন জুড়ে, আর সমস্ত অতীতের মনমরা গন্ধ একেবারে মুছে নতুন গন্ধে ভরে গেল আমার চেনা কলকাতা। এখন থেকে সব অন্যরকম। এখন ইস্কুল থেকে তুচ্ছ যা কিছু গল্প সংগ্রহ করে আনি, তা আসে নতুন বৌদির জন্য। নতুন বৌদি পিত্রালয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন দেখলে বিশ্ব বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা চলে যায়। যেখানে পুরোনো কলকাতার সীমানা, সেই দক্ষিণ থেকে তিনি কতকটা খোলা হাওয়া এনেছিলেন আমাদের গলির জীবনে। সে হাওয়া কেবল একা আমাকে নয়, ছোট বড সকলকেই স্নিগ্ধভাবে আন্দোলিত করেছিল। বয় স্কাউটদের সঙ্গে ক্যাম্পে গিয়ে দাদা দীর্ঘ চিঠি লিখলেন বাড়িতে, নতুন বৌদির প্রতি যে মনোযোগ আর শ্রদ্ধা নিবেদিত ছিল তাতে সে যেন আমাদের ছোটদের সকলের হয়ে

দেওয়া। কোথাও যাত্রাকালে নতুন বৌদি প্রণাম করলে—যে বাবা মৃদুস্বরে বলতেন, বেঁচে থাক, সুখে থাক মা--সেই সামান্য কথায় যেন সব গুরুজনদের শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেত। মা বলতেন, এমন নরম ধরণ-ধারণ ঠিক ঠাকুর কন্যের ছিল, দেখলেই ছ্যাঁৎ করে ওঠে বুকের মধ্যে। বড্ড ভালবাসতেন তো ভাইকে যত্ন করতে ফিরে এসেছেন।—এ রকম বিপরীত সম্পর্কের ভিতরে মা ভালবাসার ননদকে খুঁজছেন দেখে বাবা হাসতেন, হাসতাম আমরাও। তুচ্ছ কথায় আনন্দ ভরে উঠত। কিন্তু সে খুব অল্পদিনের জন্য। যাঁকে নিয়ে আমার বাল্যের প্রবল আনন্দ জেগেছিল, তিনিই আমায় অচেনা শোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেলেন। হঠাৎ শূন্যতা কাকে বলে, আমার একেবারে হঠাৎ জানা হয়ে গেল। সেই শূন্য বাড়িতে আমাদের রেখে মা কোথাও যাবেন এমন সম্ভাবনা ছিল না। অথচ ঠিক সেই সময়েই আমাদের রেখে যাবেন না সঙ্গে নিয়ে যাবেন —মা-র সম্মুখে এই সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছিল থেকে থেকেই।

যিনি আমার কাছে কেবল দূরাগত ভয়ের মতো, গল্পকথার বিস্ময়কর আদর্শ ছাত্রের মতো, সেই বড়দাদা মা-বাবার সমস্ত ভবিষ্যৎ কল্পনার প্রধান কেন্দ্র ছিলেন। প্রত্যাশিত ভাল চাকরী পেলেন তিনি। বড়দাদার মনের মতো অধ্যাপনা কিংবা গবেষণা নয়।— পরিবারের দশজনের নির্ভর হয়ে ওঠার মতো ভাল চাকরী,— এটি পেতে তাঁর কিছু বিলম্ব হচ্ছিল। পেয়ে ট্রেণিং ক্যাম্পে গিয়েই তিনি আপাততুচ্ছ দুর্ঘটনায় জড়িয়ে গেলেন এমন করে, প্রাণ বাঁচাতে তাঁর অঙ্গচ্ছেদ করতে হলো। বড়দাদার এই ক্ষতি বড় বিষম বাজল আমাদের বাড়িতে।

সে সময়ে সবে পরিণত বয়সে দাদামশাই লোকান্তরে গেছেন। বহরমপুরের বাড়িতে তাঁর পোষা বিড়াল তানাপুরী তাঁকে ডেকে

ডেকে আর খুঁজে খুঁজে রোগা হয়ে গেছে। বোষ্টমী দিদিমা কেঁদে যাচ্ছেন। বহরমপুরের ভিটেয় বসে তাঁর শেষকৃত্য হচ্ছে। দাহুপুর থেকে কাকারা, গোয়াড়ীর জ্যেঠিমা, এমনি সমস্ত আত্মীয়জনে বাড়ি পরিপূর্ণ। একেক জনের উপর একেক রকম ভার। কাঙালী বিদায়ের ভার ভাগ করে নিয়েছেন কয়েকজন মিলে। বৃষ সংগ্রহ করছে কে? ব্যস্ত বাস্ত ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ছোট কাকা।

দাদামশায়ের শেষ মুহূর্তে বাবা কলকাতায় আটকে গিয়েছিলেন অফিসের কাজে, কাছে ছিলেন মা, মুখাগ্নি করেছেন তিনি নিজে। পিণ্ড দানে অধিকার প্রথম তবে তাঁরই হলো না? —রাজা দশরথ কার পিণ্ড প্রথমে নিয়েছিলেন? সীতার। বলে তিনি আর গোয়াড়ীর জ্যেঠিমা পুত্রবধূ ভূমিকার গুণ কীর্তন করছিলেন। এমন দিনে কার্যব্যপদেশে শ্রাদ্ধ বাড়িতে অনুপস্থিত বড় দাদার তুর্ঘটনার খবর এল। এই তুর্ঘটনা আর দাদামশায়ের তিরোধানকে জড়িয়ে কথা বলতে লাগল সবাই। অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গও রদ হলো না অবশ্য।' কিন্তু খুব গভীর শোক আর ভয় ঘিরে রইল আমাদের। বয়স্করা বললেন, গুরু দশার বছর বাবার, কেমন কাটে কে জানে। আনুষ্ঠানিক নিয়মভঙ্গ কোন মতে সেরে বাবা ফিরে এলেন কলকাতায়। পিছু পিছু এলেন মা আমাদের নিয়ে, এই বৃহৎ শ্রাদ্ধ কাজের সমস্ত দায়দায়িত্ব সেরে, যা ঘরে তুলবার তুলে রেখে, যা বিলোবার বিলিয়ে দিয়ে। ট্রেণে উঠে তিনি জপ করতে সুরু করলেন, শিয়ালদহে নেমে আমার এক মামাতো দাদাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন, হাসপাতাল থেকে আসছ? প্রাণে বেঁচে আছে তো সে?

এর পর থেকে বড় দাদার সমস্ত সুবিধা অসুবিধা, সাংসারিক দায়-দায়িত্বকে মা নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা ও দায়ের সঙ্গে এক করে নিলেন। তাঁর যেখানে যখন যাওয়ার দরকার পড়ে, বাবা তো

সঙ্গে যাবেনই, মারও সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে গুছিয়ে দিয়ে এলে ভাল হয় কি না এ প্রশ্নে মাকে বারবার মন স্থির করতে হচ্ছিল। বৌদিদির অভিজ্ঞতা অল্প, কোলে কচি কাঁচা, সংসারে নতুন সদস্য বাড়ে বৎসরান্তে। মা সামাল দিতে যেতে চাইলে ছেলেদের রেখে যেতেও পারেন, বড়ও তো হয়েছে তারা। মেয়েরা বড় হতেও মুশকিল, ছোট থাকলেও হাঙ্গামা। তাই, বড় দাদা যখন সরকারী কাজে নানাস্থানে বদলী হয়ে ফিরতে লাগলেন, মা-র সঙ্গে আমাদের দুই বোনের কলকাতায় থাকাও কতকটা অনিয়মিত হয়ে এল। এতে ইস্কুলের কাজে মন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেতে লাগল। দিদিমণিরা খেদ করতে লাগলেন। শেষে যখন তাঁদের ছেড়ে যাওয়ার সময় হলো, তাঁরা আমাকে হস্টেলে রেখে যাওয়ার জন্য আমার অভিভাবককে অনুরোধ-উপরোধ করলেন। বিদ্যালয় যে কেবল পাঠ্যাভ্যাসের স্থান নয় সামাজিক যোগ তৈরি হয়ে ওঠার ক্ষেত্র, সে কথা মনের ভিতরে কোনমতে পৌঁছবার আগেই আমি মা-বাবার সঙ্গে বহরমপুরে চলে এলাম।

আমি খুব ঝাপসা মতো একটা আশা করেছিলাম আমাদের শেষ পর্যন্ত যাওয়া হবে না। বাবা এবার একটা জোর খাটাবেন। খুব শান্ত স্বভাবের মানুষ হয়েও তো অসম্ভব রেগে যেতে পারতেন একেক সময়ে আমার বাবা। খুব রাগী হেডমাষ্টারের মতো দেখাত তখন তাঁকে। সেই যে একদিন দাদার ওপর রেগে গিয়েছিলেন বাবা, ঘরের জলনালী চাপা দেওয়া ইঁট হাতে তুলে বলেছিলেন, ইঁট দিয়েই মেরে ফেলবেন দাদাকে। কী করেছিলেন দাদা। জিওমেট্রি বইয়ের আড়ালে ব্লেকের গল্পের বই রেখে পড়ছিলেন তো শুধু। বাবা ঘরের অন্যদিকে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, বোঝাই যায় নি তিনি ধরতে পেরেছেন ব্যাপারটা। ছেলেদের পড়াশুনো বিষয়ে উগ্র লক্ষ্য ছিল বাবার। ছেলেরা স্কুলে যাবে আর বাড়িতে আসবে, পাড়ায় খেলবে না, মিশবে না, একমাত্র স্কুলের প্রাইজে পাওয়া

বা অনুরূপ বাছাই করা বইগুলি ছাড়া নাটক নভেলের বইগুলি পড়ে সময় নষ্ট করবে না—এই রকম একটা নিয়মতন্ত্র বিষয়ে আস্থা ছিল তাঁর। তখনকার বি. এ. এম. এ.-র দাম ছিল বেশ ফার্স্ট সেকেণ্ড হওয়ার দামও সম্পূর্ণ খেলো হয়ে যায় নি, এগুলিকে খুব মর্যাদা দিতেন আমার বাবা। সেই মর্যাদায় ঘা পড়বে, মেঝেয় বসে কষ্ট করে পড়াশুনো করেই ছেলেদের স্বর্ণ পদক আনার যে ধারা তৈরি হয়েছে সে ধারা গল্পের বইয়ের নেশায় শুকোবে—এ সব ভাবনা তাঁকে অমন বিষম রাগে রাগিয়ে দিতে পেরেছিল সেদিন। বাবার সেই রকম কঠিন ভ্রূকুঞ্চন, রাগে অন্ধকার মুখ আবার একবার দেখতে কি ভাল লাগত আমার? এমনিতে লাগত না, মোটেই না। কিন্তু এবছরের কথা অন্য।

এবারে বাবার রাগের খুব দরকার ছিল। রেগেমেগে সবাইকে কারবালা ট্যাঙ্ক লেনেই যার যার কাজে ঠিক মতো বসিয়ে দিতেন বাবা, কী ভাল যে হতো! কিন্তু না, সেরকম কিছু হলো না। কতকটা মনমরা, অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন বাবা। বাবার সেই-যে বইয়ের তাকগুলি আমার মন টানত, বই, মাসিকপত্র সব নামিয়ে সে তাকগুলি খালি করে ফেলা হলো। আমি সবে কিছুদিন হলো লুকিয়ে লুকিয়ে ওখান থেকে একখানি দুখানি বইয়ের স্বাদ নিচ্ছি; হঠাৎ ছুটির দিনের দুপুরে বাবা পলাতকা আর চিত্রা থেকে পড়ে শুনিয়েছেন কয়েকটি কবিতা, এমন দিনে তাক হলো খালি, আর, মা-র সংসারপাট তুলে ফেলার, মোটঘাট গুছিয়ে তোলার ঝোঁকে নিতান্ত অগোছালভাবে বিক্রি হয়ে গেল মানসী ও মর্মবাণীর পুরোনো সেট, বাঁধানো বিচিত্রা, ভারতবর্ষ, বঙ্কিমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের অজস্র বই, ইংরেজী পত্রপত্রিকা। এ খবর শুনেও বাবা তেমন রাগে রেগে উঠলেন না যাতে সকলে ভয়ে একেবারে থমকিয়ে যায়। বললেন, বাঃ, সব গেল?

না, একেবারে সব নয়। রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করা গেছে, কেনার্ন ডয়েলকেও। মা গুণগুণ করে বলতে লাগলেন, আমি দেখতে পেয়েই অমনি থামিয়ে দিয়েছি তো। আমি কি বই'একখানাও বেচতে বলিছি? এই এত এত পুরনো কাগজ সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কী হবে, তাই কাগজঅলাকে ডেকে ঐ গুলো শুধু বেচে দিতে বলা হয়েছিল। —এর পরে, ছেলেমানুষ ছেলের এ দোষ যদি মা'র দোষ হয়ে থাকে, তাহলে মানুষ বাড়িতে এসে দাঁড়াতেই যে সব কথা কানে তুলে দেবার অভ্যাস হচ্ছে মেয়ের (দুধে-দাঁত-ভাঙা মেয়ের!) এ দোষ কি বাবার নয়—এই সব যুক্তি তর্ক উঠে যেতে লাগল। বাবা উঠে তাঁর ছাড়া-পাঞ্জাবীটি গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বোঝা গেল, বাবা এ রকম একটা কাণ্ডের পরেও তর্কাতর্কি বাড়িয়ে রেগে যেতে চান না। এই মোটঘাট বেঁধে যাওয়াটা তবে হচ্ছে। ভেবে ভেবে আমি দ্বিতীয় বার আত্মজীবনী লিখিতেই বসে যেতাম যদি না প্রথমবারের মর্মান্তিক ব্যর্থতার কথা তখনো আমার খুব স্পষ্ট মনে থাকত। তখনো দুটো একটা যুক্তাক্ষর ঠিকমতো বেরোয় না আমার হাতে, বাবার কুইঙ্কের কালির দোয়াত টেবিল থেকে মেঝেতে নামিয়ে নিজের হ্যাণ্ডেল কলম ডুবিয়ে লিখতে সুরু করেছিলাম আত্মজীবনীর প্রথম পর্যায়। বাবা অফিসে, মা নিচে কাজে ব্যস্ত, ধারে কাছে জগৎ সংসার এবং শাসন ব্যবস্থা অনুপস্থিত। —আমি তখনো জন্মাইনি মা-র কজন ছেলেমেয়ে না জানি—এই পর্যন্ত দিব্যি লিখে কের নিব ঠেকিয়েছি কালির দোয়াতে, আর দয়াহীন দোয়াত উল্টে পড়ে গেছে মাটিতে। বাবার দোয়াতে হাত দেওয়া একে নিষেধ, তার উপর সে দোয়াত উল্টে গেলে কী হয় অনুমান করতেই ভয় করে। আমি তাড়াতাড়ি অপরাধের চিহ্ন মুছে ফেলতে গিয়ে যেই মা-র হাত মোছার গামছাখানি দিয়ে কালি চাপা দিয়েছি মা এসে উপস্থিত। প্রমাণ হ'য়ে গেল ধর্মের কল

বাতাসে নড়ে। আমি তখনো জন্মাইনি? তোমার জন্মানো আমি বের করছি—বলতে বলতে মা আমার মা নিষাদতুল্য প্রথম শ্লোককে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন।

দ্বিতীয়বার এ নাটক দেখতে আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না। আমি কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে আমার রাজকন্যা চম্পার গল্পকে বিয়োগান্ত করে দিলাম। এর পরে যতটুকু মনের ভার বাকি রইল সেটুকু লাঘব করা গেল 'কোন লগনে জনম নিলাম' গেয়ে গেয়ে। কলকাতা ছেড়ে আসার আগে আমার যে-পিসতুতো দিদির বিয়ে নিয়ে আমাদের বাড়িতে সবাই মিলে খুব জড়িয়ে গিয়েছিলেন, সেই দিদি রাজকন্যার গল্পটি লুকোনো জায়গা থেকে বের করে পড়ে ফেলে আমায় সর্বসমক্ষে ধরিয়ে দিলেন। আমি খুব ভয়ে ভয়ে রইলাম কদিন পাছে এঁরা সব চলে গেলে লেখালেখি নিয়ে মা আমাকে বকতে থাকেন। কিন্তু মা-র সেরকম বকুনি দেবার অবসর হলো না। ক্রমে আমাদের কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার সময় এগিয়ে এল। দিদির বন্ধুরা সব

কমলালেবু বেলের পানা
সতী ছাড়া কেউ খুলো না

—লিখে চিঠি পাঠিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাল।

। ১৪ ।

বহরমপুরে আমরা এর আগেও বেশ কয়েকবার গেছি। বৌদিদিকে নিয়ে যেবার যাই, সেবার ছাড়া, কেমন যেন তেমন করে মন ওঠে নি কিছুতেই। সেখানে না আছে গ্রামের খোলা মাঠ। খেতের আল বেয়ে অকস্মাৎ এঁকে বেঁকে চলে যাওয়া সরীসৃপ, না আছে কলকাতার আশ্চর্য জ্যামিতি। কেমন যেন না-শহর না-গ্রাম, বহরমপুর তারই নাম। বহরমপুরের কাছাকাছি কত কিছু যে মানুষজন দেখতে যায়,—হাজার দুয়ারী কিংবা কাশিমবাজারের রাজবাড়ি—সে সবের সন্ধান পাই নি অনেকদিন। গরমের দিনে কুয়োর জলে বালতি নামিয়ে দিয়ে দড়ি ধরেই খুশি থাকতে হতো। লালগোলাঘাট প্যাসেঞ্জার গিয়ে পৌঁছতো দিনে দুবার করে,—সন্ধ্যে সন্ধি আর ভোরবেলায়। ভোরে পৌঁছলে প্রত্যূষের আলোয় নামটা পড়া যেত। সন্ধ্যেয় স্টেশনের নাম আঁকা লণ্ঠন হাতে গাড়ির এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে একটি লোক টেনে টেনে বলতে বলতে যেত : বহরমপুর কোর্ট। হুড়োহুড়ি করে নেমে পড়তাম আমরা, শীতের সন্ধ্যে হলে বুকে হাত জড়োসড়ো করে. গরমের সন্ধ্যেতে ঘাম মুছতে মুছতে। প্রথম প্রথম যখন গিয়ে নেমেছি, নেমেই আমার বিষম ইচ্ছে করত ঐ হেঁকে যাওয়া লোকটিকে খুঁজে বের করে দুটো কথা বলি। কলকাতার রাস্তায় জল দেবার কাজটা নেব বলে মনের মধ্যে যে সংকল্প স্থির রেখেছিলাম, একে দেখে সেটি পাল্টে যেত। মনে হতো, সুলুক সন্ধান পাইতো এ কাজটা আমি এক্ষুনি নিই, হাঁক দিতে আমি খুব পারি। কিন্তু বাবার নজর এড়িয়ে

সন্ধানে যাওয়া হতো না আমার। মালপত্র নামানো নিয়ে ব্যস্ত থাকলে কী হবে, আমাকে নড়ে চড়ে বেড়াতে দেখলেই সেদিকে নজর চলে তাঁর, 'চুপ করে মা-র কাছে দাঁড়াও' বলে হুকুমজারি হয়ে যেত তক্ষুনি।

গরমের দিনে দুপুরে ট্রেনের ভিতরে কী কষ্ট হতো। খানিক এগোতেই সোজা রোদ এসে পড়ত কামরার ভিতরে, কেবল পিপাসা পেত আমার। মেয়েদের ইণ্টার কামরার ধারে বাবা খোঁজ নিতে এলে মা বলতেন, জল পাওয়া যায় না কি দেখ তো? কতক্ষণ থামবে এখানে?—বাবা জল আনতে প্লাটফর্মের দূর প্রান্তে চলে যাচ্ছেন দেখলে কেমন ভয় করত আমার, তাতে পিপাসা বেড়ে যেত আরো। সেই শুকনো ঝাঁজের মধ্য দিয়ে পার হয়ে যেত পলাশী, বেলডাঙা, পাগলাচণ্ডী, পাগলাদহে মা পয়সা ফেলে দিয়ে নমস্কার করতেন হাতজোড় করে। ক্রমে রোদ মরে আসত। ভাবতায় সন্ধ্যে লাগে লাগে, সারগাছিতে তারাগুলি উঠতে শুরু করেছে একে একে; বহরমপুরে রাত। শীতের প্রহর হলে বহরমপুর কোর্টে নেমে মনে হতো রাত্তির যেন দুপুর হয়েছে। নিঃঝুম পথে ক্যাঁচ কোঁচ করতে করতে ঘোড়ার গাড়ি চলত, বেতের স্বনন শোনা যেত থেকে থেকে। কোচোয়ানের বসবার বাক্সের কাছে টিমটিমে একটা ঘেরা বাতি জ্বলত। কোচোয়ান গলা দিয়ে কেমন শব্দ করত কখনো কখনো ঘোড়াটার উদ্দেশ্যে।

আমাদের যাওয়া হতো প্রায়ই গ্রীষ্মের ছুটিতে, সবাই বলত, আম খেতে। মুর্শিদাবাদের আম তখন কেবল নাম নয়, স্বাদও ছড়াত। দাদামশাই গাড়ি ভর্তি আম কিনে ঘর বোঝাই করে ফেলতেন। আমরা খেতাম, অসুখ বাধাতাম, আবার খেতাম। দাদামশাই সরেস সাজা তামাক সেবন করতে করতে বলতেন, বৌমার ছেলেমেয়ে সব পেটরোগা, এই ক'টা আম খেতে পারে না?

দাদামশাই থাকতেই একবার পুজোর শেষ দিকে এসেছিলাম আমরা। সেই একবার মনে পড়ছে। মাকে বলে বুঝিয়ে স্থানীয় ছট পুজোর শোভাযাত্রায় সঙ্গ নিয়েছিলাম। দলের সব হিন্দুস্থানী মহিলারা কারা, কোথা থেকে তারা এসে একত্রে জড়ো হলো— এ সবের চেয়ে যাত্রাপথে ওদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে যাওয়ার প্রণালী বিষয়ে আমার প্রশ্ন ছিল ঢের বেশি। আলুর মা, যাকে আমাদের দাদামশাই মেয়ে ডাকতেন, বললেন, দণ্ডী দিতে দিতে যাচ্ছি,—বলেই ফের সাট পাট উপুড় হয়ে গেলেন মাটিতে। তিনিই এই পূজার্থী দলে আমার অভিভাবিকা, তাঁর সুপারিশেই আমি এখানে আসতে পেরেছি। গঙ্গার ধারে পেঁাছে সবে ভাবছি আমিও গড় হয়ে পড়ব কিনা মাটিতে, এমন সময়ে দেখি, আমাদের বাড়ির সর্বমঙ্গলবিধাত্রী দ্বিজর মা একটু দূরে এসে দাঁড়িয়ে তারস্বরে কী যেন বলতে চাইছে আমাকে। এগিয়ে যেতে শোনা গেল, বাবুমশায় বুলছেন ফিরতে হবেক।

বাড়ি ফিরতে দাদামশাই হেঁকে বললেন, তোর বাবা নেই এখেনে, তুই কার হুকুম নিয়ে বেরিয়েছিলি শুনি?

মুখের ভিতরে কটা দাঁত বাকি ছিল দাদামশায়ের কে জানে, মনে হতো একটাও না। শব্দগুলি তাই একটু মজার শোনাত, কিন্তু তাতে তাঁর কথার তেজ একটুও কমে নি। তাঁর ঘরে আমার আকর্ষণের জিনিস ছিল তাঁর হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স। কোনো ফাঁকে গুটি কতক শাদা বড়ি খেয়ে ফেলতে পারলে মুখটা বেশ মিষ্টি হয়ে যেত। ওতে কী করে কারো অসুখ সারে আমি ভেবেই পেতাম না।

আমাদের গোপিনী দিদিমা দোক্তা খেতেন, খুব মিষ্টি গন্ধ ফোড়ন দিয়ে নিরামিষ তরকারী সাঁতলাতেন, নিজের হাতে গোয়াল কাড়া থেকে গরুগুলির যাবতীয় যত্ন করতেন, আমাদের কাছে খবর

নিতেন—আজ কি ছেলে আসবেন—অথচ বাবা ধারে কাছে এসেছেন টের পেলেই মাথায় ঘোমটা টেনে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। দ্বিজর মা ছিল সংসার আর গোয়ালের সমস্ত রকম কাজে এঁর ডান হাত। বাড়ির সংলগ্ন জমিতে ঘর তুলে দিয়ে এদের বসত করিয়েছিলেন দাদামশাই। দুটি ছেলেমেয়ে আর স্বামীকে নিয়ে নিজের সংসার সামলেও সারাদিন কত কাজ যে করত দ্বিজর মা! কেউ কেউ তাকে মেয়ের নাম দিয়ে কুড়ানীর মা বলে ডাকত। তার আসল নাম যে নন্দরাণী এ কথা অন্যে পরে কা কথা তার স্বামীও প্রায় ভুলে এসেছিল। সবারই মতো সেও স্ত্রীকে দ্বিজার মা কিংবা কুড়ানীর মা বলে ডাকত। দ্বিজর মা আর আমি পরস্পরকে কথাচ্ছলে গল্প বলে নিতাম থেকে থেকেই; দ্বিজর মা শুনত একটা দুটো সিনেমার কিংবা ছাপা বইয়ের গল্প, আমি শুনতাম কোথায় কোন খানে কোন দেবতার পুজো দিতে হয়। গরুকে বাণ মারা মানে কী। কুড়ানীর বিয়ের সম্বন্ধে তারা টাকা নেবেনা ভেবে রেখেছে, তবে গয়নাগাটি, একটা ভোজ সে তো বর পক্ষ দেবেই, তাই নিয়ম যে। কালো পাথরে খোদাই করা মুখের মতো মুখ ছিল দ্বিজর মার, কপালে টিপ দিলে মুখখানি বেশ আঁকা ছবির মতো হয়ে উঠত। বহরমপুরে কোথাও যেতে আসতে সে হলো আমাদের চলনদার। পাহারা দেওয়ার ব্যাপারে সে যে তার স্বামী পুত্রের চেয়ে ঢের বেশি যোগ্য ছিল, এতে কারো কোনো সন্দেহ ছিল না। কোন সামান্য গোল বাধতে না-বাধতে সে এমন প্রবল বেগে ঝাঁঝালো কথা শোনাতে শুরু করে দিত যে ধারে কাছে কেউ তখন দাঁড়াতেই সাহস করত না। তার বৃহৎদর্শন, স্বভাবনিরীহ স্বামী ভোলানাথ ব্যাকুল ভাবে বলত, হল্‌ছে, হল্‌ছে, তু আর বকিস না।

ছেলেমেয়ের কাপড়জামা লালদীঘিতে গিয়ে ধোপদস্ত করে আনত মাঝে মাঝে দ্বিজর মা, সেই সঙ্গে সে সংগ্রহ করে আনত

পাড়ার নানারকম খবর। নলিনাক্ষ সান্যাল থেকে শুরু করে নানা গণ্যমান্য লোকের খবর তো সে-গল্পের ঝুলিতে থাকতই, কুমার হস্টেলের ছেলেরা কী গণ্ডগোল করছে সে খবরও বাদ যেত না। এত গল্পের ঝুলি বয়েও সে যে মায়ের সংসারে অক্লেশে নিত্যকর্মী হিসেবে প্রবেশাধিকার পেল, তার কারণ গল্প সংগ্রহের বেলায় যেমন, কাজ গুছিয়ে তোলার বেলায়ও তেমনি তার দক্ষতা ছিল অসামান্য। মাঝে মাঝে খুব বেখাপ রকমের শিরঃপীড়ায় সে নিজের ঘরে পড়ে থাকত, তার ছোট মেয়ে কুড়ানী তখন মা-র কাজে সাহায্য করতে এলে বাবার অ্যাসপিরিনের বড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হতো মেয়ের হাত দিয়ে। গুটি দুই বড়ি গিলে মাথাধরা সামলে নিয়ে খানিক বাদে সে এসে তখন দেখা দিত। আমরা সবাই খুশি হয়ে উঠতাম।

॥ ১৪ ॥

কলকাতা ছেড়ে বহরমপুরে চলে এলাম আমরা শীতের সময়ে, ইংরেজী হিসেবে বছরের শুরুতে, যুদ্ধের গরম আমাদের পিছু পিছু এল, তা আমরা কেউ টের পাই নি। এসেই আমাদের স্কুলে ভরে দেওয়া হলো। দু বোনকে এক সঙ্গেই। দিদির তখন স্কুল পর্ব ফুরোতে বছর তিনেক দেরি। স্কুলের ঘোড়ার গাড়ি আমাদের দুজনকেই নিয়ে দিয়ে যাবে ঠিক হলো। কলকাতাতে কিন্তু আমরা পর্দা স্কুলের বাসে যেতাম না। কিরণ নামে শক্ত একহারা চেহারার স্কুলের দাসী আমাদের চলনদারের কাজ করত। দরজায় দাঁড়িয়ে

সতী এস বলে কেমন একরকম টান দিয়ে দিদিকে ডাক দিত সে। তার কথা ভেবে আমাদের মন কেমন করতে লাগল। আর, কাছাকাছি সকলে ব্যবস্থার ঘটা দেখে মুখ টিপে একটু হাসলেন। তাঁদের হাসির কারণ ছিল। স্কুল সত্যি এমন কিছু দূরে ছিল না। দল বেঁধে কিছু কিছু মেয়ে নিজেরা নিজেরাই যাতায়াত করত স্কুলে, তাদের কেউ দিদির চেয়ে দু' এক ক্লাস নিচে পড়ে, কেউ বা উপরে। যোগাযোগ করে তাদের সঙ্গ নেওয়া ভয়ানক শক্ত হতো না আমাদের পক্ষে। চলনদার-হীন খোলা পথে যেতে হতো অবশ্য অনেকটা। সবাই তো তাই যাচ্ছে? পর্দাপ্রথার যে রেওয়াজ কলকাতাতে নামহীনতার সুবাদে আমাদের সংসারে ধরা ছিল, তাকে এ গ্রামতুল্য মফঃস্বলে ধরে রাখা যাবে কী করে? অনেকে বললেন, এটা বড়লোকী চাল দেখানোর চেষ্টা। বাবা যে এই সম্প্রতি অবসর নেবার পূর্বে রায়সাহেব খেতাব পেয়েছেন, তার সঙ্গে এ ঘোটকযানের আর আমাদের অমিশুক স্বভাবের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চলতে লাগল। তার উপর যখন আমাদের বাড়িটি দোতলা করবার জন্য মিস্ত্রীর কাজ শুরু হয়ে গেল, তখন আর কারো সন্দেহই রইল না যে, বেশ জমাট ধনের আড়ম্বর দেখানোর উদ্দেশ্যেই আমার বাবা এ অঞ্চলে আস্তানা নিয়েছেন। টাউনহল ক্লাবে বাবাকে এজন্য কতটা কী সইতে হতো কে জানে, মাকে স্নানের ঘাটে এবং আমাদের ইস্কুলে নানাপ্রকার বেআব্রু প্রশ্ন ও মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হলো। মা রেগে গেলেন বাবার ওপরে। আমি ইস্কুলের ওপরে। ফলে কথা হলো এই যে, আমি সামান্য সাংসারিক ছুতো পাওয়া মাত্রই স্কুল ছেড়ে বাড়িতে বসে রইলাম। আর, বাড়িটা ঢেলে সাজানো হবে, না, যেমন ছিল সেই রকমই থাকবে, এর কোন দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত মা বাবা নিতে না পারায় বাড়িটা ঢালা হলো, সাজানো হলো না, ঐ এরকম খাপছাড়া হয়ে রইল।

বাড়িতে যে বিজলী বাতির ব্যবস্থা হলো, তাতে পর্যাপ্ত দ্যুতি এল না; কিন্তু লণ্ঠনের শ্রী-ও গেল অন্তর্হিত হয়ে বহরমপুরের ঘর থেকে।

বহরমপুর একদিন বঙ্গ-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন বহরমপুর থেকেই বের হতো। এসব খবর আমাকে তখন কেউ বলেন নি। আমি নিজের মনে বড়দের আড়াল করে টাউনহল লাইব্রেরী থেকে যত বই যে করে পারি পড়ে ফেলি। মুশকিল হয় ইংরেজী বইগুলিকে নিয়ে। অভিধান না দেখলে মানে বোঝা যায় না সব। আর অভিধান খুলে বসে ব্যবস্থা করে পড়তে গেলে পড়া শুরু হতে না হতে বাবা ফিরে আসেন তাঁর ঘরে! এই লুকোচুরির মাঝখানে কত আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে আমার চেনা হয় যারা আমাকে কাছাকাছির মলিনতা থেকে আড়াল করে। বাইরের জগৎ,—যার সীমা বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির অব্যবস্থা, কাঁচা ড্রেন, প্রকাশ্য দিবালোকে মলবহনের বেনিয়মে বিধৃত নয়,—সেখানে স্বচ্ছন্দে বিনা চলনদারে একা একা চলে যাই আমি বাংলা সাহিত্যের পথ দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার দারুণ চেনাজানা হলো এই সময়ে। আর, বিদেশী কাহিনীগুলিকে চিনলাম এক বৃহৎ বাংলা অভিধানের পরিশিষ্টভাগে। এই প্রমাণ ওজনের বই আমি যতক্ষণ ইচ্ছে খুলে বসে থাকলেও কেউ বলতে পারত না যে আমি পাঠ্য বই পড়ছি না। অভিধান যদি পাঠ্য না হয়, পাঠ্য তবে কী? বরং বড়রা অনেকে অবাক হতেন অভিধানে আমার মন দেখে। তাঁরা তো জানতেন না আমি ওখান থেকে লোভীর মতো সংগ্রহ করে নিচ্ছি আনাতোল ফ্রাঁসের থেই, ইবসেনের গোস্ট্‌স্—যাতে ইংরেজী ভাষ্য কতকটা বোধ্য হয়ে ওঠে যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ব এসব বই, লাইব্রেরী থেকে আনা বই, বাবাকে লুকিয়ে।

আমাদের বাড়ি থেকে গঙ্গার পথে যেতে দেখা যেত সেই প্রাচীর যাকে আমি মনে মনে দুর্গের প্রাচীর বলতাম। এটি ছিল, এখনো

রয়েছে, কয়েদখানা—কখন পাগলদের জন্য, কখন বা রাজবন্দীদের জন্য। প্রাচীরের পাশে তখন ঘাসে ধোপা ধোপানীরা কাপড় বিছিয়ে দিত শুকোতে। অশ্বত্থ বটের ফল, পাতা এসে পড়ত একটা দুটো টুপটাপ। ঘড়িতে ঘণ্টা বাজত। আমাদের বাড়ির সামনের পথটিকে যদিও তখন থেকেই নয়া সড়ক নামে সম্মান-চিহ্নিত করার পাকা প্রস্তাব ছিল, লোকে কিন্তু বলতে বলত বাজারের রাস্তা। খানিক এগোলেই পৌঁছনো যেত বাজারে। সেখানে ছিল বিখ্যাত লালাদের ছানাবড়ার দোকান। সড়কের দুধারের বাসিন্দাদের ভিতরে ডাক্তার বৈদ্য থেকে শুরু করে নানা পেশাদারী মানুষকে দেখা যেত। কিন্তু গোরাবাজারে ভদ্দর লোকদের পাড়া বলে দাবী ছিল নতুন পাড়ার। মা বলতেন, হবে না? এখানে তো রাজ্যের গোয়ালাদের বসত দেখছিস না? ওধার দিয়ে দেখ আবার ধাঁঙরদের মাদল শোনা যাচ্ছে। বাড়ি তো ঠাকুর ভাল জায়গায় তোলেন নি। শ্বশুরের ভিটে, তাই থাকা।

আমাদের বাড়ি থেকে কয়েক পা হাঁটলেই গিয়ে ওঠা যেত নতুন পাড়ায়! শুধু একটা রাস্তার মোড় আর গলির আড়ালের জোরে সেটা দাঁড়িয়েছিল ভিন্ন পাড়াতে। সেখানে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের পুরোধা ছিলেন স্থানীয় এক কলেজ অধ্যাপকের পরিবারের সদস্যরা। এঁদের কুটুম্ব সম্পর্কের সূত্রে দিল্লীতে যাতায়াত ছিল নিয়মিত, যোগাযোগ ছিল পণ্ডিচেরীর সঙ্গে। সেই সুবাদে এঁরা জনজিহ্বাকে অগ্রাহ্য করে অনেক স্বাধীন আচারব্যবহার শুরু করেছিলেন। চল্লিশের দশক তখন শুরু হয় নি, এঁদের মেয়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়তে। ধারে কাছে অনেকেই মনে মনে আশা করেছিলেন একটা কিছু অঘটন ঘটবে, মজা বোঝা যাবে তখন। সে রকম কিছু অবশ্য হয় নি। স্থানীয় মহিলা সম্মেলন বসত কখন এঁদের বাড়িতে, কখন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে, কিন্তু

প্রধানত ঐ পাড়াতেই। জমিদারবাড়ির গৃহিণীও সে সভায় এসে দেখা দিয়ে, হাতে পান নিয়ে যেতেন। সে ঘরোয়া বৈঠকে প্রবীণ বালবিধবা বুলিদিদি হারমোনিয়ম বাজিয়ে পরিচ্ছন্ন গলায় ভুল সুরে "বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে" গাইতেন। কিছু পাঠ হতো। তারপর সুরু হতো রান্না কিংবা আচার তৈরি শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে নানা পরচর্চা। মা বাড়িতে এসে বলতেন, দূর, ও সব করে কী হয়? তার চেয়ে ঘরে বসে ভগবানের নাম করলে কাজ দেবে।— আবার কখনো বলতেন, শিখিনি তো কিছুই কখনো। এক জন্ম গেল যত দিদি শাশুড়ী, পিসশাশুড়ী, ননদ, তাদের সেবায়। তারপর ছেলে মেয়ের গু-মুত ঘেঁটে। এখন, এখন আর কি, জপ কর। —বলতে বলতে কোন কোনদিন তিনি সত্যিই জপে রত হয়ে যেতেন, কোনদিন পুরোনো গল্প করতেন।

খুব ছোট কালে, বয়স যখন তাঁর পুরো দশ-ও হয় নি, তখন কেমন করে পূজার ফুল তুলতে তুলতে তিনি এ বাড়ির সংসারে এসে উপনীত হলেন, সে সংসারে ধন নেই কিন্তু পুরাতন ধন মাহাত্ম্যের দম্ভ আছে, আছেন প্রাচীনা পিতামহী। বালবিধবা পিতৃষ্বসা, আর, তাঁদেরই অনুগত নিজে। এর ওপরে ঠাকুর কন্যে আসতেন মাঝে মাঝে, ঠাকুরঝি তো রয়েই গেলেন,—কখন কঠোর, কখন স্নেহ-কোমল স্বরে বলতেন তিনি হারিয়ে যাওয়া জমিদারকুলের দীন মানুষগুলির গল্প। বলতেন, ঐ একটি প্রাণের উপর ভরসা, এত দায়িত্ব সামলাতে পারব ভাবি নি। যাঁর করিয়ে নেবার, তিনিই করিয়ে নেন। তোমার বয়সে আমি কত দেখেছি, কত শিখেছি।

শুনতে শুনতে আমার মন চলে যেত সেই কালে যখন বাড়ির পুরুষ সদরে গেছে খবর পেয়ে ডাকাত পড়েছে এসে ধন দৌলত নারী নিয়ে যেতে। বাড়ির ছাদ থেকে প্রজাদের আঙিনায় লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে তরুণী দিদিশাশুড়ী কোমর ভেঙেছেন।

তারপর, লুঠে আর মামলায় হৃতসর্বস্ব বাড়িতে যখন অন্ন নেই, পড়শী প্রজাদের দৃষ্টি এড়াতে মায়ের দিদিশাশুড়ী উপবাসী মুখে পান পুরে, ঠোঁট রাঙা করে রাখছেন, রূপের উজ্জ্বলতায় পরনের শাড়ির জীর্ণতা ধরা যাচ্ছে না। ভাতের বদলে বাগানের ফল আর বসত-প্রজাদের ঘরের ছানার সন্দেশ খেয়ে বাবার বাল্য কাটছে, মায়ের বদলে পিসীকে মা ডেকে।

মায়ের এ রকম পূর্ব স্মৃতিচারণ আমার বাবা পছন্দ করতেন না। যখন তিনি থাকতেন, তখন এ সব কথা উঠে গেলে তিনি প্রায়ই বলে উঠতেন, হ্যাও, হ্যাও, তুমি তো সব জান।

সম্পূর্ণ জানুন চা-ই না জানুন, আমাদের গ্রামের ভাঙা বার বাড়ি, চণ্ডীমণ্ডপ, দালান, মন্দিরের গুপীনাথ বিগ্রহ মায়ের কথার দাক্ষিণ্যে, রঙে, রসে ভরে উঠত। দেশে গেলে তেমন সুন্দর কিছু দেখতে পেতাম না, তবু, সে শ্রীছাঁদ বর্জিত গ্রামকে মা কথার স্বাদে কী সুষমায় ভরে দিতেন যে! কাকা, খুড়িমা তাঁদের অজস্র সন্তান-সন্ততি নিয়ে কোলাহল তুলে সে মাধুর্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেন নি কখনো।

বাবা স্পষ্টতই এ ভাবে দেখতেন না ব্যাপারটাকে। তিনি ভাবতেন গ্রামের বাড়িকে কী করে সাধ্যমতো ঝকঝকে এবং নাগরিক প্রথামতো আরামপ্রদ করে তোলা যায়। সমস্ত গ্রামকেই এমন করে গড়ে তোলার একটা স্বপ্ন ছিল তাঁর। ইস্কুল নিয়ে খেটেও ছিলেন খুব। বাড়ির ভিতরে একখানি ঘর তিনি গড়েছিলেন মনের মতো করে। উঁচু, বড়, ঝরঝরে খটখটে মেঝে। সেখানে ঢালা বিছানা করে আমরা শুতাম পুজোর সময়ে। এক পাশে উঁচু চৌকিতে বাবার বিছানা।

॥ ১৫ ॥

বহরমপুর থেকে আমাদের দাদুপুরে যাওয়া হয়নি একবারও। বাবা চলে যেতেন থেকে থেকেই দাদুপুরে কাজ সেরে আসি বলে। মা বলতেন, দুই জায়গায় দুই পা রাখা মানুষ। সে সময়ে বাবা ঐ রকমই চেষ্টা করছিলেন, কলকাতা আর গ্রামে, দুই প্রান্তে দুই পরিকল্পনা সাজিয়ে তোলার। কলকাতায় রয়েছে ড্রাগ হাউসে ছোড়দাদার নিজস্ব নতুন চেম্বার। আর, গ্রামে বাবা নিজে শুরু করেছিলেন কাজ নিজেকে জড়িয়ে, ইস্কুলে। দাদুপুর থেকে ছোটকাকা এসে রইলেন ছোড়দাদার কাছে কলকাতায় ডাক্তারী দোকান সাজানোর কাজে। আর কালুদাদা এল পড়তে বহরমপুরে আমাদের বাড়িতে থেকে। এভাবে দেশগ্রামের আর পরিবারের নিকট ও দূর সকলেরই ভরসাস্থল হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন বাবা। কিন্তু, এ সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড তাঁর সামর্থ্যের অনেকটা বাইরে চলে যাচ্ছিল! সেটা টের পাওয়া গেল যখন চল্লিশ সাল পার হয়ে গেল, যুদ্ধ আর পশ্চিম রণাঙ্গনের ঘটনা হয়ে রইল না। রেডিও আর খবরের কাগজের সীমানা ছাড়িয়ে যুদ্ধ এসে আমাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংসারেও-ওলটপালট এনে দিল। টাকা পয়সা এভাবে হাতের খোলা গাছের তলা না করে ফেললে এ রকম হতো না—আমার মা বললেন। হয়ত কতকটা তাই। কিন্তু, সে জন্য বাবার বেহিসাবকে দোষ দেওয়া বৃথা। বাবা টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগের কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যাপৃত-ছিলেন। তাঁর অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে মহাযুদ্ধ প্রথম-

বারের চেয়েও বড় মাপে বেধে যাবে, আর তৈজসপত্রের দাম সমস্ত কাল্পনিক অঙ্ককে ছাড়িয়ে যাবে, তা তিনি জানবেন কেমন করে? সত্যি বলতে, যুদ্ধ যখন প্রথম বাধল, তখনো ধরা যায়নি এর চেহারা কেমন দাঁড়াবে। তখনো আমরা ছোট ছোট পারিবারিক ঘটনাগুলি নিয়ে জড়িয়ে আছি। ছোড়দাদা মাঝে মাঝে আসছেন যাচ্ছেন, কলকাতার হাওয়া আসছে তাঁর সঙ্গে। আমরা যাচ্ছি বড়দাদার কাছে পূর্ব বাংলায়,— দিদি তো গিয়ে বাজিতপুরে রয়েই গেল মাস দুই তিন। সে সময়ে আমার চিঠি লেখা মকশ করার বিশেষ সুযোগ ঘটে গেল একটা। এত ঘন ঘন চিঠি লেখার সুযোগ কোথায় কবে পেয়েছি? এত কথার উপদ্রব সইবেই বা কে? মার সঙ্গে হাতে হাতে কাজ শিখি, দুপুরে বসে প্রচুর বই পড়ি, বিকেলে ছোট বাগানে গিয়ে বসে বসে চিঠি লিখি। মা বলেন, আমার হয়েও দু ছত্র লিখে নে। অত্র পত্রে সতী........

এখানেই স্কুলে ফেরা হবে না কলকাতায়—হয়তো ফের কলকাতাতেই এই রকম একটা ভাবনা তখন আনাগোনা করছে মনে মনে। একজন বয়োবৃদ্ধ মাষ্টার মশাই, গৃহশিক্ষকের ভূমিকার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর ভিতরে বয়সই যাঁর প্রধানতম গুণ, আমাদের পাঠাভ্যাস করাতেন বহরমপুরে বাড়িতে এসে। এর বেশ কিছুদিন আগে এক গ্রীষ্মের ছুটি কাটানোর বেলায় বহরমপুরে কমল মাষ্টার-মশাইকে পেয়েছিলাম। মুদিখানার দোকানে তিনি পাঠশালা খুলেছিলেন। বাড়িতে এসে দুপুর বেলায় দিদিকে 'অন্নপূর্ণা উওরিলা গাঙ্গিনীর তীরে', পড়িয়েছিলেন মানে করে করে। সেই সময় থেকেই আমি কোন এক অলিখিত নিয়মমতো ধরে নিয়েছিলাম যে বাড়িতে মাষ্টারমশাই এলে তিনি দিদির তত্ত্বাবধান করে যাবেন। আমি ইচ্ছে হলে তাঁর কাছে বসতে পারি। নয়তো নিজের মনে দু কলম চার কলম লিখব পড়ব, চট করে এক সময়ে হয়ে গিয়েছে

মাষ্টারমশাই' বলে পালিয়ে যাব। এই অভ্যাস জন্মে যাওয়ায় আমার পড়া কতকটা ছেলেমানুষী খেয়ালখুশিতে এগোচ্ছিল, নিয়ম মেনে নয়। কোন বই ইচ্ছে হলে দশবার পড়ে ফেলতাম। কোন বই—যেমন ইংরেজি গ্রামার ছোঁয়াই হতো না। বাবা কলকাতা থেকে বই এনে দিতেন রাশি রাশি। কিন্তু পড়া ধরবার কিংবা পরীক্ষা নেবার কোন নির্ধারিত প্রথা না থাকায় আমার কতদূর লেখা হয়েছে কিছু ধরা যেত না। মাষ্টারমশাই বাঁধা দিনে আসতেন যেতেন, কিন্তু দিদি বহরমপুরে না থকেলে তাঁর কাজ নিতান্তই অল্প থাকত সন্দেহ নেই।

কলেজে ভাল ছাত্র বলে দাদাদের সুনাম রটছিল। সেজদাদা পটু বক্তা হিসেবেও মান পেয়েছিলেন কম নয়। কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক হয়ে স্থানীয় রাজনীতির কেন্দ্রের কাছাকাছি গিয়েছিলেন তিনি কতকটা। দলে দলে কত যে ছাত্র বন্ধু ডাক দিয়ে যেত তাঁকে। এক সময়ে দাদা ছাড়া সেজদাদার কথা ভাবাই যেত না, সর্বদা ছোটভাইকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার কোনো পুরস্কার থাঁকলে সেজদাদা তখন সেটি অর্জন করে ফেলতেন। এখন সম্পাদকীয় কাজকর্মের ভিড় তাঁকে কতটা সরিয়ে দিল দাদার কাছ থেকে। দাদা তাঁর নিজের একটি দুটি বন্ধু, আর সাহিত্য দর্শনের চর্চা নিয়ে মেতে উঠলেন। কলকাতা থেকে যখন সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের খবর এল তখনও দিন কাটছে এমনি করে। সেজদাদা মিস্ত্রী মজদুরদের সাম্যচিন্তা ও সাক্ষরতার পাঠ দিচ্ছেন মাঝে মাঝে। দাদার সঙ্গে আমরা একত্রে মা-কে পথের দাবী কিংবা গোর্কীর মা পড়ে শোনাচ্ছি। এ সব বই হচ্ছে মানা-করা বই, মার সঙ্গে কথান্তর চলছে তাই কখন কখন সে সব নিয়ে।

মা তাঁর মেয়েদের জন্ম নিজের কৈশোরের তুল্য একটি জগত গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন তখন। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় নাপতিনী

আসত প্রায় মাসে একদিন, ঝামা দিয়ে পা ঘসে আলতা পরিয়ে দিয়ে যেত পাতা টিপে টিপে। খোপানী এসে তার সুখদুঃখের গল্প করে যেত। বাড়ির ভিতরে ছোট ঘেরা জায়গাটিতে বাগান বাগান খেলা করতে করতে আমরা শুনতে পেতাম মা আমাদের বোষ্টমী দিদিমার ঘরের দাওয়ায় ভাগবত কিংবা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ পড়তে শুরু করেছেন, দ্বিজর মা-ও বসে গেছে শুনতে।

বহরমপুরের পরিবেশ স্পষ্টতই মায়ের বাল্যে চেনা পরিবেশ থেকে অনেকটা পৃথক ছিল। গঙ্গার পথে যেতে এখানেও একটি শিব-মন্দির ছিল ঠিকই, চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলের মাথায় জল দিতে যাওয়া যেত সেখানে। কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে আজানের গভীর ধ্বনি শোনা যেত প্রত্যহ। সন্ধ্যেকালে রমেশদের গরুর পাল মাঠ থেকে যেমন ফিরত, নিকট প্রতিবেশী রমজান বুড়োর দোরগোড়ায় চেরাগ জ্বলত অমনি। আর মহরমে যে কী দারুণ তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা বেরোত, কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের পাড়াতে যা দেখেছিলাম তা এর কাছে কিছুই নয়। তাছাড়া হায়রে হাসান হায়রে হোসেন বলে আনুষ্ঠানিক বুক চাপড়ানো আমি এর আগে কখন দেখিই নি। কলকাতা ছাড়বার আগে বিষাদ সিন্ধুতে কারবালার যুদ্ধ আর হাসান হোসেনের কাহিনী পড়েছিলাম বলে এ সমস্ত অনুষ্ঠান কতকটা অর্থ পেয়েছিল আমার কাছে। কিন্তু দ্বিজর মায়ের দ্বিজ যেমন অবলীলা-ক্রমে এতে যোগ দিতে পারত আমি তেমন পারতাম তা নয়। ব্যারাকে দুর্গাপুজোর মণ্ডপও তেমন টানল না আমায়। বড় বেশি কথা সেখানে, আর পাণ্ডামির ঠেলাঠেলি। এখানে কলকাতার কলরব, আলোর উজ্জ্বলতা কিছু নেই। তেমনি নেই দাদুপুরের মণ্ডপের পারিবারিক স্নিগ্ধতা।

দাদুপুরে পুজো আমি একবারই দেখেছিলাম। পাটুলি দিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেবার। নৌকোর ছইয়ের ভিতরে আমরা,

মাথার উপরে অবিরল বৃষ্টি, নদীর জলে বৃষ্টির জল পড়ছে কি এক রকম শব্দ করে—কান ফেরানো যায় না। খুব ভিজে, কাদাপিছল পথে পা ঘষে ঘষে কোনমতে গিয়ে উঠেছিলাম বাড়িতে। ছোটখাট একটি ভিড় ছিল দরজার সামনে আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য,—অসময়ে কী বাদলা, নদী পেরোতে গিয়ে ঠাণ্ডা লেগে যায় নি তো আমাদের ?

সেখানে পুজোয় সিদ্ধেশ্বরীতলার সাজ, দেবীবরণ, তারপরে সন্ধি পুজোয় বলির পাঁঠার আর্তনাদে দিদির একেবারে সাদা হয়ে গিয়ে মণ্ডপ থেকে পালিয়ে যাওয়া—অন্য রকম, সে সব অন্য রকম। আর, সেই রাত্রে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে যাত্রার আসরে 'আজি ক্যানে গো নিধু বনে, রাধাকিষ্ণ একাসনে পুষ্প শয্যায় শুয়ে নিদ্দা যায় গো, এক পালঙ্কে শুয়ে নিদ্দা যায়' শোনা ? সে সুর কোথায় বহরমপুরে ? বহরমপুরে পুজোর কাপড় নিয়েই কত কথা। কোনদিন নব বস্ত্র ছাড়া চলে না, তাই বলে মিলের কোরা কাপড় পরতে আছে না কি ? ধেৎ! ভালো তাঁত পরতে হবে। অষ্টমীতে সবচেয়ে ভালো যেটা আছে সেটা পরলে আর অন্যদিন একেবারে নতুন না পরলেও চলে। একটু পুরোনো হলেও বাহারে কাপড় পরলেই চলে। মণ্ডপে সময় কাটাতে একটুও ভালা লাগে নি আমার। তার চেয়ে ঢের ভালো বিজয়ার দিন ভেবে ভেবে সেই সব কাজ করা, যেগুলো ভালো কাজ, (কেন না, সারা বছর তো সেই কাজই চলবে, বাঃ, বিজয়াতে করা হলো যে) আর তারপরে সন্ধ্যায় নৌকো ভাড়া করে নদীতে ভেসে বেড়ান, যতক্ষণ না অনেক রাত হয়, বিসর্জনের বাজনা থেমে আসে। সেদিন বাড়ি ফিরে বাবা মাকে প্রণাম করে নারকেলের মিষ্টি খাওয়া শুরু হতো, শেষ হতো কোজাগরীতে, পাড়া আর ভিনপাড়ার শেষ প্রণম্য লোকটিকে প্রণাম করে। কার বাড়িতে কেমন খাবার তৈরি হয়েছে এ নিয়ে এক ধরনের অপ্রকাশ্য রেষারেষি চলতো যেন।

কোনো পাড়ার মাসীমা বলেই ফেলতেন, ওদের বাড়িতে সবচেয়ে আগে প্রণাম করতে গিয়েছিলে? ওদের চিঁড়ে জিরে সবচেয়ে ভালো, না?

রাস পূর্ণিমায় কাশিমবাজারের রাজবাড়িতে মেলা বসে যেত। কৃষ্ণনগরের কুমোর এসে মাটির মূর্তি দিয়ে কত পৌরাণিক গল্প যে বলতো, দলে দলে সবাই দেখতে যেত। রাস পূর্ণিমার সে ঢেউ বাড়িতে বাড়িতে লাগত না তেমন, কিন্তু ঝুলনে বহরমপুরে অনেকেই বাড়িতে রাধা কৃষ্ণ পট কিংবা ছোট মূর্তি ঝুলনে উঠিয়ে দিত। রথযাত্রার জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার মতো ঝুলনের রাধাকৃষ্ণ নিয়েও ছোট ছেলেমেয়েরা 'পূজো পুজো' খেলত।

॥ ১৬. ॥

পুজোর পরে একটি দুটি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখা যেত, বাঁধা বরাদ্দ ছিল সে সবের চেহারা। বালিকারা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী এসব ভূমিকা নিয়ে একটা বেশ বড় নাটক, কতক পার্ট ভুলে, কতক মনে রেখে, মোটামুটি নামাল তো আবার টাউনহল থিয়েটারে। বয়স্ক সদস্যরা করলেন তরুণ তরুণী সেজে অভিনয়। আমার যদিও কলকাতার ইস্কুলে থাকতে থিয়েটারে উৎসাহ কারো চেয়ে কম ছিল না, এখানে একবার এইরকম অনুষ্ঠানে কর্ণ কুন্তী সংবাদে কর্ণ সাজতে বলায় আমি সে প্রস্তাবে কর্ণপাতই করি নি। কর্ণ সাজবেন আমার পাড়াতুতো দিদি, আর আমি তাঁকে বলব 'তবে আয় বৎস'—ভাবতে আমার নিতান্ত বিসদৃশ ভাবের উদ্রেক

হয়েছিল। তিনি সেবার একাই স্টেজের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে কর্ণ আর ডানদিকে দাঁড়িয়ে কুন্তী সেজে অভিনয় করে গিয়েছিলেন। একে কি একক অভিনয় বলা চলে ? সে সব কেউ বলে নি কিন্তু।

বয়স্কদের নাটকে প্রায়ই মেক-আপের গণ্ডগোল হতো। যেমন, নাটকের এক কঠিন ঈর্ষাঘন মুহূর্তে, স্ত্রী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুলে হাত ছুঁইয়ে সবে 'আমার চেয়েও সুন্দরী ?'—এই সখেদ সার চিন্তা করে উঠেছেন, অমনি তাঁর মেয়েলী দীর্ঘ কালো পরচুল সরে গিয়ে কাঁচা পাকা কদমছাঁট চুল পড়েছে বেরিয়ে।

কে জানে, আগেও কলকাতাতে যখন মেডিক্যাল কলেজে দাদাদের নাটক দেখেছি তখনো হয়তো এসব ত্রুটি থাকত। কিন্তু দেখতে পাই নি সেসব। 'ঠাকুরপো' বলে ফুকরে উঠলে বুঝে ফেলতাম ঐ কিরণময়ী এল, গলাটা যে বড্ড মোটা শোনাচ্ছে তা কানে ঠেকে নি। একবার বাবার অফিসে দেখতে গিয়েছিলাম থিয়েটার। অফিস স্টাফের নাটক। 'মহানিশা', 'মহানিশা' বলতে বলতে যখন ধীরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন নাকি ষ্টেজের পিছনে কাঠের সিঁড়ির ধাপ ভেঙে বেচারী ভদ্রলোক পড়ে গিয়ে ব্যথাই পান। কিন্তু আমি তো সে সব গল্পে শুনবার আগে পরিষ্কার শুনেছিলাম জলের শব্দ,—ঐ ঝাঁপিয়ে পড়ে গেল জলে! এখন আমার চোখ আর কান বেশি তীক্ষ্ণ। চোখের তেজ বেড়ে যাওয়ার একটা কারণ ছিল নতুন চশমা। আগে মঞ্চের উপরে মুখগুলি সবই একরকম দেখাত, কাপড়ে চোপড়ে সংলাপে ধরে নিতাম কে আসে কে যায়, ইদানীং আমাদের টনাদাদা আমাকে কাদাইয়ে নিয়ে গিয়ে চক্ষুরুন্মীলন করে দেওয়ায় সে দৃষ্টি-সাম্য দূর হয়ে গিয়েছিল। ছোটখাট খুঁত কেবলি দেখতে পেতাম। সেইসব ভুলভ্রান্তি, ভাল-মন্দ মিশিয়েই ছিল ওখানকার উৎসব। গ্রামের যাত্রা যেমন ছিল না, তেমনি কলকাতা থেকে পেশাদার দল আনা ছিল নিতান্তই

দৈবের ঘটনা। কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে যেবার কলকাতার শিল্পীরা এসে গান গাইলেন, আমাদের সম্মোহিত করে দিয়ে গেলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সে হলো রীতিমত নতুনত্ব। এর ভিতরে যুদ্ধের উত্তাপ এসে একেবারে কী বিপরীত চমক দিয়েই না গেল।

টালির ছাদ এসে গেলেও এ অঞ্চলে অনেক ঘরেই ছাঁচ বেড়ার মাথায় চাল ছিল খড়ের, টালির নয়, এমন কি খাপরারও না। শীতকালে মাঝে মাঝে রাতের বেলায় এসব চালে আগুন ধরে উঠত। আগুন লেগেছে—বলে রব তুলে দিত কেউ, আমরা শুনতে পেলে ঘরের আগল খুলে উঠোন সংলগ্ন দালানে এসে দাঁড়াতাম। দেখতাম আকাশের কোনো এক কোণা রাঙা হয়ে উঠেছে, আর কিছু বোঝা যেত না। একবার সে আগুন লাগল এসে আমাদের বাড়ির সামনের গোয়ালাদের সারি সারি ঘরের চালে। দোলের উৎসবের সময়টা। ওদের সমারোহের পরব। সেদিনটা ওরা অরন্ধনের ফলার খাবে। খই, মুড়কি, দুধ, বাতাসা সংগ্রহ হয়েছে। কাপড়ে হোলির রং ধরতে শুরু করে দিয়েছে। ওরা গেছে দল বেঁধে ভরতপুরে গঙ্গা নাইতে, ফিরে এসে আনন্দের ফলাহার হবে। কেউ কি কোথাও উন্মুক্ত শিখা রেখে গিয়েছিল কাঠের চুল্লীতে? রাতে নয়, দিনের বেলায় আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের সে আশ্চর্য শিখা, মানুষের কান্না, প্রতিবেশীদের ছুটোছুটি এ সবের মাঝখানে আমাদের বাড়ির উঠোনে মেঝেতে জমে জমে উঠতে লাগল এই দগ্ধ-আশ্রয় পরিবারগুলির হাতা বেড়ি, ঘটি, বাটি, কলসী, কাপড়, যা যতটুকু বাঁচান গিয়েছিল—সব। তাদের ছেলেমেয়েরা বসে রইল আমাদের মেঝের ঘরে, সিঁড়ির নিচে, সন্ধ্যে অবধি। তাদের সাধের ফলাহারের উপকরণ জ্বলে গিয়েছিল। চিড়ে মুড়ি সংগ্রহ করে যা তাদের খেতে দেওয়া হয়েছিল তাতে এমন কোন

উৎসবের স্বাদ ছিল না। বড়রা বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল, কেউ বা দোষ দিল অন্য কারো অসাবধানতাকে।—তাদের চোখের সামনে তাদের ঘর একেবারে ছাই হয়ে মিশে গেল ধুলোয়। বিরাট খসির স্তূপ শুধু ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলতে থাকল সারারাত, পরের দিনও। এমন করেই কি সেবার যুদ্ধের তাপ এসে আমাদের ছুঁয়েছিল? হঠাৎ, একেবারে দিন দুপুরে ঘরবাড়ির অভ্যস্ত আশ্রয় ভেঙে দিয়ে? না, ঠিক একেবারে অমন করে নয়, তবে এটা ঠিক যে কী করে কী হলো তা ধরবার আগেই আমাদের অভ্যস্ত স্বস্তি ভেঙে চুরে গিয়েছিল।

বুঝতে যেন চান নি কেউ। সেই যখন প্রথমে এসেছিলেন বর্মা প্রত্যাগত মানুষ দূর সম্পর্কের চেনাজানার সূত্রে এখানে থাকতে। বাড়ির পুরুষ ছিল না সঙ্গে, মেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছিল। পর্যাপ্ত সংখ্যক বিপদের কাহিনী সংগ্রহ করে উঠবার আগেই বুদ্ধি করে তাঁরা সরে এসেছিলেন বলে তাঁদের প্রতি সমবেদনা দেখানর আগ্রহ ছিল না যেন কারো। তাঁদের মেয়েদের বর্মী চালচলনে আকৃষ্ট পাড়ার বেপাড়ার বখাটে ছেলেরা উপদ্রব করত তাঁদের ওপরে, এতে ভদ্দর পাড়ার মাসীমাদের রায় শোনা গিয়েছিল, ঐ রকম সব মেয়ে নিয়ে একা একা অমন থাকা কেন?

আমার মা খুব বিষণ্ণ, খানিকটা চিন্তিতভাবে বসেছিলেন, রাণীকে ওরা উৎখাত করে ছাড়ল, টিকতে দিল না মেয়েদের নিয়ে,—দেখলে?

নতুন নতুন ভাবনা আসছিল মা-র মনে। খাঁটি জিনিস উধাও হয়ে যাচ্ছিল বাজার থেকে। নতুন অনেক কথা উড়ে আসছিল এদিকে সেদিকে। যে সব বাড়িতে দালানে বাগানে চেনা বাংলা গান শুনেছি এতদিন, সেখানে হঠাৎ কেউ কেউ গান ধরছিল, 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাই,'—সবাই তাতে গলা

দিচ্ছিল এমন নয়। যারা দিচ্ছিল তারা সকলেই বিদেশী সরকার এবং জাপানের ব্যাপারটা বুঝে দিচ্ছিল, তা-ও নয়।

এইসব গান তৈরি হচ্ছিল কলকাতায়। কিন্তু সে কলকাতাকে আমার সঙ্গে তখনও কেউ আলাপ করিয়ে দেয় নি। আমি নিজেও এগিয়ে আসতে পারি নি চেনাজানা করবার জন্য। চল্লিশের পরে আমি কিছুদিনের জন্য শহরে এলাম নিতান্ত আকস্মিক যোগাযোগে। ঢাকুরিয়া লেকের কাছে দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাট বাড়ি, এই কি কলকাতা? জানলায় বসে দেখি চেনা যায় কিনা। অন্য পথে অন্য রকম মানুষ হাঁটে, আইসক্রীম ডেকে যায় ম্যা গ নো লি য়া। জানলার বাইরে ফুটপাথের বকুল গাছ ফুল ঝরায়। সে পথ দিয়ে নিজেদের ইচ্ছে মতো কত মেয়ে, কত ছেলে, বুড়ো, হেঁটে চলে যায়, বেড়ায়। আমার তো তখনও একা বাইরে যাওয়ার হুকুম নেই। নইলে আমি কতবার কত দিকে গিয়ে ঘুরে ঘুরে কী-ই না দেখে আসতাম। তার বদলে আমি কেবল জানলা দিয়ে লোক চলাচল দেখি। এ ফ্ল্যাট বাড়িতে ছাদে যাওয়ার উপায় নেই। ছাদ আমাদের নয়। মনে মনে ইচ্ছে করে উত্তরেতে যাই। আরেক ফ্ল্যাটের রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের গান বাজে উৎকর্ণ হয়ে শুনি। কখন বা চলতি ছবির রেকর্ড শোনা যায় পানের দোকান থেকে—গরমিল কিংবা ঐ রকম কোনো ছবি। কমল দাশগুপ্ত তখন সুর দিচ্ছেন খুব। প্লে ব্যাক গান চালু হয়ে গেছে প্রায়, মীরার গান কি সীতার গান বলে সদা সর্বদা গায়িকার নাম লুকোনো হচ্ছে না আর। রেডিওতে সোজাসুজি ফিল্মের গান গাওয়া অবশ্য বন্ধ হয়ে আছে। বন্ধ হয়ে গেছে সায়গলের বেতারে গান গাওয়া। কিন্তু আই. পি. টি. এ. র গান বলে কিছু তো বাজছে না কলকাতা রেডিওতে? সে গান তবে কোথায় বাজে? কারা শেখায়—ভাবতে ভাবতে আমি রবীন্দ্রনাথের গান শুনি মন দিয়ে। কী

আশ্চর্য কথা সে গানের, তবু, সুরের টানে আমার মন দূরে দূরে চলে যায়। অন্য সুর, আরো অন্য রকম সুর মেলে না? সবই যদি নতুন, সুরও নতুন চাই।

॥ ১৭ ॥

সেই বর্ষাতেই রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়ার শব্দ শুনে আমার সত্যি যেন ঘুম ভাঙল, আমি একমুহূর্তে জানলাম তিনি কতখানি জুড়ে ছিলেন। আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছে করল তাঁকে। একবারও আমি তাঁকে দেখব না? কতদিন তিনি ছিলেন। আমি তাঁকে দেখবার জন্য অস্থির হই নি। কোনদিন হবো নিজেও জানতাম না। বড় বড় লোকদের দেখার জন্য ভিড় করার কোন মানে হয়? তাঁদের তো কাজ আছে ছোট ছেলে মেয়েদের দেখা দেওয়া ছাড়া। এসব আমার জানা ছিল। কিন্তু আমি তো এখন আর ছোট নই। আগের চেয়ে অনেক বড় আমি। দাদারা গায়ে হাত তোলেন না, তুললে বাবা বকেন তাদের। মা শাড়ি ধরিয়ে দিয়েছেন আমাকে রীতি মতো। তাছাড়া, আর তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজ করবেন না, এখন আমি গেলে তাঁর কাজে আর কী ক্ষতি হবে?

আমার অনুনয় বিনয়ে বাবা হয়ত কতকটা অবাক হয়েছিলেন। আমার সমস্ত ভাবনা প্রকাশ করে বললে বাড়িতে খুব বিসদৃশ শোনাবে বলে আমি কেবলই দীনভাবে 'একবার যাব' 'একটু যাব'

বলছিলাম কিনা। বাবা নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন আমাকে।

আমাদের বাড়িতে দুই ভিন্ন তরফের কথা এসে পৌঁছেছিল খুব। প্রথম যুগে যখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ও তাঁর ভক্তবৃন্দ নানা কথা তুলেছেন সে গল্প জমেছিল বাবা মা-র ঝুলিতে। তারই কিছু কিছু টুকরো পেতাম আমরা কথাচ্ছলে মাঝে মাঝে। পরে আবার যখন 'শরৎচন্দ্র লেখেন, বাঙালী পাঠকদের জন্য, আর রবীন্দ্রনাথ লেখেন লেখকদের জন্য' বলে একটা ধুয়ো উঠেছে তার খবর এসেছিল আমার কাছে দাদার জবানীতে। স্কুলের শেষ পর্যায় থেকে দাদা তখন রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য চর্চায় মগ্ন। প্রবোধ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব নিয়ে মত্ত, মাঝখানে এসে পড়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বলছেন, পড়ে দেখ্, পড়ে দেখ্। ভালো জিনিস কাকে বলে। এরই মাঝখানে কখন আমাকে রবীন্দ্রনাথ এমন প্রবলভাবে অধিকার করেছিলেন, কে জানে!

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে শরৎচন্দ্র কিংবা পরবর্তী ছেলেমানুষ লেখকদের তর্কাতর্কি বাবা গায়ে মাখতেন না মোটেই। তাঁর বিস্ময়ের কারণ ছিল ভিন্ন। আজ তিনি জোড়াসাঁকো যান নি ঠিকই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বাবা খুব কাছের থেকেই দেখেছিলেন। তাই যেন তাঁর মনে হতো এমন কী আর বিশাল পুরুষ! তবে হ্যাঁ, অল্প বয়সে দরাজ গলায় গানটি গাইত ভাল, এ কথা বাবা মানতেন। আমার মা পরিষ্কার বলতেন যে কান্ত কবি অনেক ভালো লিখেছেন, লোকেরা সে সব মনে রাখে না। বড় লোকের বাড়ি থেকে এসেছে তাই রবিঠাকুরকে বড় বড় বলে নাচে।—বলেই তিনি দৃষ্টান্ত দিতেন, 'হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস', দেখ তো কেমন প্রাণ ভরানো কথা কান্ত কবির?

প্রথম যেদিন কল্পনার পৃষ্ঠায় কবিতাটিকে আবিষ্কার করে মাকে

চমকে দেবার আশায় বইখানা নিয়ে মা-র কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, মা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, ঐ তো ঢুকিয়ে দিয়েছে দেখ, চিরকাল সক্কলে জানে এ লেখা কান্ত কবির, করে দিল অমনি রবিঠাকুরের !

রবীন্দ্রনাথহীন কলকাতা, যুদ্ধের খবর শানানো কলকাতা ছেড়ে আমরা ফিরে এলাম, এবারে কেমন যেন নতুন করে নির্জন, বহরমপুরে। আমাদের বোষ্টমী দিদিমা আমরা বহরমপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেই চলে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে তাঁর ভীত, ক্লান্ত মুখখানির স্মৃতিও আর যেন কোথাও নেই, উঠোনে কিংবা ছাঁচতলায়। তাঁর মৃত্যুর পর ত্রিরাত্রি কেটে গেলে, যেখানে সংকীর্তনের আসর বসেছিল, সেখানে এক বর্ষার জলেই আগাছার জঙ্গল গজিয়ে গেছে। আগাছায় গ্রাস করেছে আমার বাগান। আমাদের দ্বিজর মা গরুগুলির তদারক করেছে সাধ্য মতো, কিন্তু এত কাজ সে একা হাতে সামাল দেবে কী করে? দ্বিজর বাবাকে ঘরামির কাজে, মুনিষের কাজে লাগতে হয়েছে,—যখন যেমন পেয়েছে। মা তো ওদের অনেক টাকার ব্যবস্থা রেখে যেতে পারেন নি যে বিনা কাজে তাদের চলে যাবে শুধু আমাদের ঘর বাড়ি দেখে শুনে? জিনিষ পাতির দর আস্তে আস্তে বাড়তে সুরু করেছে, গোচারণের মাঠ ঘেরা হয়ে যাচ্ছে—গরু গিয়ে পড়লে তাকে খোঁয়াড়ে দিয়ে দেয়। মানুষ জন কেমন পালটে গেল বুঝি। আগে বাড়িতে একখানা দুখানা ঘর খালি থাকত, অতিথি সজ্জন এলে থাকত সেখানে, এখন দেখ কত ভাড়া বসিয়েছে এদিকে সেদিকে। এই ভাড়া নিয়ে-আসা মানুষজনের সঙ্গে আমাদের কিছু কিছু যোগ যেমন বাড়তে লাগল, আমাদের দু বোনকে নিয়ে এমন করে এখানে থাকার ব্যাপারে মা-র ভয় তেমনি বাড়তে লাগল আস্তে আস্তে। মা-র উদ্বেগ আমাদের নিরানন্দ করে তুলছিল। জাপানের বোমা

এসে কলকাতাকে সম্পূর্ণ উদ্বেলিত না করলে এ ভাবে আমাদের 'কতদিন কাটত কে জানে।

বোমাতে যত না কাঁপল কলকাতা, তার চেয়ে বেশি কেঁপে গেল ছোট ছোট মফঃস্বল শহরগুলি. কলকাতার মানুষজন যেখানে সাময়িক আশ্রয় নিলেন। বাজারে জিনিষ আসে কম, যা ও বা আসে, দেখতে না দেখতে অগ্নিমূল্যে বিকিয়ে যায়। স্থানীয় কোনো পত্রিকা ভ্যানচি বাবু বলে এই সব লুব্ধ শহরাগত ক্রেতাদের কটাক্ষ করে দু' দশ কথা লেখে। কোন প্রতিকার হয় না।

দাদারা এলেন কলকাতা থেকে। বোমা, যুদ্ধ, পড়াশুনো করে আর কী হবে, জাপানী তাহলে শিখে নিতেই হবে,—এই সব অল্প স্বল্প হাসি আর ছোট ছোট ভাবনার ঢেউ থিতিয়ে যেতে তাঁরা ফিরে চলে গেলেন শহরে, মামাদের বাড়ি থেকে পড়তে। ছোড়দাদা গেলেন বিহারে কাজ নিয়ে। ছোট বৌদিদি রয়ে গেলেন আপাতত বহরমপুরে, আর রয়ে গেল অফিস কাছারি সমেত উঠে আসা পলাতকের দল। জঙ্গীপুর, জিয়াগঞ্জ, বেলডাঙ্গা, বহরমপুরে লোক থৈ থৈ করতে লাগল। এই কি নতুন যুগের শুরু? এই কি হঠাৎ পালটে যাওয়া? কেউ জানে না। একেক জন এক এক রকম কথা বলে, আর অগণ্য মানুষ অজস্র পঙ্গপালের মতো অরক্ষিত মফঃস্বলের পণ্য প্রাণ সুর হরণ করে নিতে থাকে। অথচ বাইরে থেকে হঠাৎ কোনো তফাৎ ধরা যায় না। সিনেমার বিজ্ঞাপন আগের মতোই মানুষের ঘাড়ে পোস্টার ছবি তুলে ধরে, বাজনা বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে সময়মত। মিউনিসিপ্যালিটির বিশেষ ঘোষণা দরকারে অদরকারে শোনা যাচ্ছে হুকুম চেয়ারম্যান বাহাদুরের ঢেঁড়ার বাদ্যিতে। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে রাবীন্দ্রিক অনুষ্ঠান একটা দুটো বেড়ে যেতে শুরু করেছে বরং, যা আগে দেখা যায় নি। নতুন পাড়ায় রবীন্দ্র জন্মোৎসবে এসে প্রধান অতিথি

হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টারমশাই বললেন—এ রকম ঘরে ঘরে কারো পুজো কখনো হয় নি, যেমন রবীন্দ্রনাথ পাচ্ছেন। তিনি যে কলকাতা থেকে পালিয়ে বহরমপুরেই থাকতে পারছেন, ঘটনাচক্রের এই যোগাযোগকে উদ্যোক্তারা ধন্যবাদ দিল বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার সময়ে। শুনলে মনে হতে পারতো এই বৃহৎ আতিথ্য ব্যাপার বহরমপুরের সকলের বেশ ভালই লাগছে। শুধু ছানাবড়ার চেহারা আর আগের মতো দেখাচ্ছে না। পরস্পরের হাঁড়ির খবর নেবার সরল অভ্যাস এমন কি মাসীমাদের ভিতরেও পরিত্যক্ত। চারিদিকে নতুন মানুষ, এখন কথা লুকোবার সময়।

বিয়াল্লিশে যখন কলকাতায় টিয়ার গ্যাস আর প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি একসঙ্গে জোর চলছে, ছোড় দাদার কাছে বিহার অঞ্চলে যাবার পথে আমরা এলাম দু দিন থেমে যেতে সেখানে। সেই উত্তর কলকাতা। কিন্তু ঠিক তেমন তো নয়। কেমন পাল্টে গেছে দেখ কলকাতা। পসারীদের ডাক নয়, বম্বে না আর কোথায় কী ডাক উঠেছে, সেদিকেই কলকাতার কান। আমার মতো বেবুঝ মনেও এ-কথা ধরা পড়তে দেরি হলো না।

আমাদের দেশের রাজনীতিতে কতদিন ধরে হাওয়া বদল চলছিল, কখনো তেজী, কখনো নিম্নচাপ। টুকরো টুকরো মন্তব্য আর নীরস খবরের কাগজ যা মেলে তার সঙ্গে স্কুলপাঠ্য বইয়ে ভারতের শাসন-তান্ত্রিক ইতিহাসের যোগ আমি ঠিকমত খুজে পাইনি এতদিন। রাজনীতির জগৎ বলে একটি জগৎ যে অফিস কাছারী, আমাদের কি অমনি আরো গৃহস্থের বাড়ি, খেলাঘর, পূজামণ্ডপ সব পেরিয়ে অন্য নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়েও হঠাৎ কেমন তার ছায়া এ সবের উপরে মেলে দিয়ে যায়,—তা আমি অনুভব করেছিলাম শুধু সাহিত্যে। দাদাদের তর্কাতর্কিতে, কোনো সভার বিবরণে হঠাৎ কখন দোলা দিয়ে গেছে নতুন-আসা সাম্যবাদী মতের ঢেউ। নামী দামী অধ্যাপক, চিকিৎসক

আইনজীবী, দীপ্ত ছাত্রবর্গ—সকলেই এক মূল্যমানের মাপকাঠি তুলে তুলে ধরেছেন। মার্কসের সমাজচিন্তাতেই যে অবধারিত স্বর্গ-রাজ্যের চাবিকাঠি আছে লুকিয়ে, সোভিয়েট দেশ যে কী আশ্চর্য মানবস্বর্গ—এই সব কথা তখন সদ্যোজাত পবিত্রতায় পরিশীলিত। আমি শুনেছি সে সব কথা কিন্তু ভিতরে ধাক্কা লাগেনি। হঠাৎ সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের খবর শুনে হয়ত আপন মনে ভেবেছি, এবার কি কিছু ঘটবে? কিছু বোঝা, অনেক না বোঝা এই আবছায়া ঔৎসুক্যে ছিল আমার দৌড়। এখন টিয়ার গ্যাসের ধমকে চোখে রুমাল দিয়ে আমার মামাতো ভাই এসে ঢুকল ঘরে আর অমনি যেন আমি দেখতে পেলাম দেশের হাওয়ায় ঝড়, সেই মুহূর্তে আমি বিয়াল্লিশের কলকাতার একজন হয়ে গেলাম আদ্যোপান্ত খবরের কাগজ, সন্ধের বেরোনো টেলিগ্রাম আমায় টানতে লাগল। কলকাতা ছেড়ে যেতে মন চায় না। শহরে মিলিটারী, শহর উত্যক্ত,—তবু সেই শহর আমাকে জাগালো, ভাবালো—যা আমি ভাবিনি এতদিন। যাদের জোরে গান্ধীজী ইংরেজকে ভারত ছাড় বলেছেন, সেই অগণ্য ভারত-বাসীর একজন তো আমি। আমার মনে হলো, মফঃস্বলে মেলে শুধু সেই অঞ্চলটিকে, কলকাতাতে ভারতবর্ষের একটা টুকরোকে দেখতে পাই, ছুঁতে পারি। কলকাতাতে আমার আবার আসতেই হবে।

বিহারের বিচিত্র বনভূমির মুখোমুখি বসে কলকাতার দিকে চোখ মেলে থাকতে কী ভাল যে লাগত আমার এক বিহার প্রবাসী অগ্রজ এ ভাবে ভঙ্গীতে স্বদেশীয়ানার গন্ধ পেয়ে ঘোর ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, জানতাম না আমিও যে কলকাতায় আমার শীগগিরি যেতে হবে।

॥ ১৮ ॥

আমার বিহার প্রবাসী দাদার ভারি ইচ্ছে হয়েছিল, যে-হু একমাত্র তাঁদের কাছাকাছি ছোড়দাদার কোয়ার্টার্সে আমরা থাকি, বেশ কেতাদুরস্ত হয়ে উঠি। কাউকে কাউকে দেখলে দাদাদের ওরকম মানুষ করে তোলার ইচ্ছে হয় না? সেই রকম। বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে গান গাইতে বললেন। কিন্তু সে এমনি গেয়ে দিলেই হবে না। তাঁর এবং বৌদির শখের অর্গ্যানটি খুলে বাজিয়ে গাইতে হবে। আমি কি বাজিয়েছি কখনো অর্গ্যান? বাঁ হাত একদিকে চলে যায় তো ডানহাত অন্যদিকে, তার ভিতরে আবার গলার সুর সামলাতে হবে। সপ্তাহ কাটতে না কাটতে আমার গলা ভেঙে গেল, খানিকটা ইচ্ছাশক্তি কাজ করছিল নিশ্চয় এর ভিতরে। চক্রধরপুর ছেড়ে চলে আসবার আগে গলা সারলই না ভাল করে। আমার অর্গ্যানে সুর সাধনাও বন্ধ হলো।

একসময়ে এঁরা এঁদের মামা, অর্থাৎ আমার বাবার বাড়িতে থেকে যখন পড়াশুনো করছিলেন, তখন আমাদের বড়দাদা ছোড়দাদা এঁদের নানাভাইকে বড়দা মেজদা ছোড়দা ইত্যাদি সম্বোধনে ডাকতেন। এ সব ডাকের নতুন বিলি ব্যবস্থা আমরা বোনেরা নানা অভ্যাস মত করে নিলেও এতদিন পরে হঠাৎ এত কাছাকাছি থাকায় ইনি দাবী করতে লাগলেন, আমাদের উচিত একে এর স্থাব্য সেজদাদা নামে ডাকা। তরুণতর সেজদাদা তখন উপস্থিত না থাকায় তাঁর এ দাবী মেনে নেওয়া হলো, কেননা তাঁর ডাক

নামটি কিছু উৎকট ছিল। নাম ধরে দাদা বলার যে প্রথা বড়দের কতক কতক আপত্তি সত্ত্বেও আমরা চালু করেছিলাম, তা এঁর বেলা প্রয়োগ করতে বেধে গেল। সেজদা তাঁদের ছোটবেলার গল্প বলতেন, এবং আমার বাবা যে এখন অনেক বদলে গেছেন সে কথা নানা উদাহরণ সহযোগে প্রমাণ করতেন। আধুনিক অনাধুনিকের যে-তর্ক তখন সাহিত্যে জোর চলছে। উঠে আসছে ক্রমে ক্রমে এমন কি আমাদের ঘরেও, সে সব তর্ক বিকেলে কি সন্ধেবেলায় জল খাবার খেতে খেতে এমন ভাবে তুলে ফেলতেন যেন নিত্য আলাপের কথা এই সবই। সেজবৌদি হাসি হাসি মুখে শুনতেন। আমি বসে যেতাম কথার পিঠে কথা চাপাতে। কেননা আমার মনে হতো অনেক তর্ক সাপেক্ষ বিষয় আছে ওর মধ্যে। আমি যে-বড়দাদাকে অসম্ভব ভয় করে এতদিন কাটিয়েছি ইনি তাঁরও বড়, এ সমস্ত তথ্য মা প্রায়ই মনে করিয়ে দিতেন আমায়। বলতেন, ধমক দেবে একদিন জোরে তখন দেখ কান্না বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আমার কান্না বেরোত না। মাঝে মাঝে বরং রাগ হয়ে যেত তখন বড়দের ওপরে নিজের কথা বোঝাতে না পারলে।

আমাদের বিহারী সেজদাদা মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে ইংরেজিতে আলোচনা তুলে ফেলতেন। তাঁর বক্তব্যের উত্তরে বাংলা বললে ফের ইংরেজিতেই বলতেন, আমি ইংরেজী বলছি, তুমি বাংলায় কথা চালাচ্ছ কেন? আমি পাল্টা প্রশ্ন করতাম কেন বাংলা বললে কী হয়?—এর পর খানিকক্ষণ বাঁকা কথা চলতো। আমি ইংরেজী বলতে পারি না, চেষ্টা করলেই শিখতে পারি অথচ চেষ্টা করি না। কেন, এই নিয়ে ফিরে ফিরে কথা উঠত তাঁর সঙ্গে। এভাবেই এ বিষয়ে যুক্তিতর্ক আমার বেশ জানা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, বলাই বাহুল্য, ইংরেজী কথোপকথন একটুও শেখা হয়নি।

ইংরেজী মাহাত্ম্য নিয়ে ইনি আমাকে উত্যক্ত করতেন বলে দেশী

শাস্ত্রগুলি এঁর কম জানা ছিল তা নয়। তাঁর অবসর যাপনের অন্যতম শৌখীনতা ছিল হাত দেখা। আমার বাবা ঠিকুজী কুষ্ঠি বানাতে দেন নি আমাদের কারো, কিন্তু এরকম ঘরোয়া আসরে করকোষ্ঠি বিচার চলত আমাদের নানাস্থানে। আমার তো খুব মজা লাগত অনেক রকম রেখা বিচারের কথা শুনতে। সত্যি হোক না হোক, উল্টো-পাল্টা তো সব কথা। বিহারী সেজদাদার করকোষ্ঠি বিচারে চমকও ছিল। ছুটির দিনে দুপুরের দাবাখেলা বন্ধ রেখে সবাই শুনছিলেন। দিদির বিয়ের জন্য কি এখন চেষ্টা করার সময় হয়েছে—এই সব সময়োচিত প্রশ্ন ছিল উপস্থিত অনেকের মনে। তিনি সে সব প্রশ্নের সঙ্গত সদুত্তর দিয়ে বসলেন আমার হাত নিয়ে। কাছে রেখে দূরে নিয়ে দু-চার পলক দেখে বললেন, এই রে, মামার এ মেয়েকে নিয়ে তো শেষ বয়সে দুঃখ আছে। খুব হ্যাঙ্গামে ফেলবে এ মেয়ে।—শুনে আমি বুঝে ফেললাম আমি যে কেবলই তাঁর সঙ্গে মানবাধিকারের নানা তর্কাতর্কি করি নেহাৎ ছোট মামাতো বোন বলে, বকেন না তেমন তিনি। এ সব মন্তব্য কিন্তু তারই ফল।

অন্যেরা কী বুঝে নিয়েছিলেন কে জানে হেসেছিলেন সকলেই। মা আপন মনে সুন্দর পাড় বাঁধাই হাত পাখা নাড়া বন্ধ করে বললেন, কী করবে হ্যাঁরে? অনেক ধার কর্জ হয়ে যাবে বিয়ে দিতে তো? সে তোমার মামা জানেন। মেয়ের চাপা রং,—এই পর্যন্ত শুনে বাবা একটা বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। বাবার অনেকদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল বর্ণমালিন্য আমার একটা আচরণের মতো। কয়েকটা বছর গেলে খুলে যাবে রং, বাবার অন্যান্য মেয়েদের মতো উজ্জ্বল দেখাবে এ মেয়েকেও, হয়না অনেকের দেরি চেহারা খুলতে? ক্রমশঃ সে ভরসা কমে আসায় বাবা এ আলোচনা আর না তোলাই ভাল মনে করতেন। বিহারী-সেজদাদা বললেন, ও সব কিচ্ছু না

মামী, তোমার এ মেয়ে স্বয়ংবরা হবে। ঐ সেই এক ভীষণ গোলমাল হবে।

শুনে মা চমকিত হয়ে দিদির স্বয়ংবরসম্ভাবনা বিষয়ে খোঁজ নিলেন ভাল করে। নেই জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে হাত-পাখা নাড়তে শুরু করলেন ফের। আমাকে নিয়ে কথাটা কেউ বিশ্বাস করলেন না, আমি তো নয়-ই। হাতের রেখার নাম করে এ রকম হাজির কথাটা বিহারী সেজদাদা বললেন; এতে হস্তরেখাবিচারে বৈজ্ঞানিক সারবত্তার যে অভাব রয়েছে, তার নমুনা আরেকবার দেখতে পেলেন উপস্থিত সকলে।

ছোড়দাদার কোয়ার্টারের বাগানে কত যে ফুল আর ফলের গাছ ছিল। আমরা যে দু মাস ছিলাম তাতে ফল ধরে ওঠার সময় হয় নি। গাছে ফল টল দেখলে কী করে ফেলতাম আমি কে জানে! বাগানে তত্ত্বাবধানে ছিল যে মালী তাঁর কাছে সমস্ত গাছ-পালা বিষয়ে খবর পত্র নিতে গেলে সে পাছে আমার হিন্দীর নমুনা দেখে হাসে এই ভয়ে আমি কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে চুপ করে তার কাজ দেখতাম। ও ভাবে হাঁ করে ঘাস কাটা কি গাছ ছাঁটা দেখা সহবতের লক্ষণ কি না এ নিয়ে। মা-র সঙ্গে একটু একটু বাদানুবাদ হতো আমার। মা বলতেন, মনে মনে যেমনই থাকি, বড় তো হয়ে গেছি আমি, ছোট নেই আর। লোকে কী ভাবে সেটা আমায় বুঝতে হবে।

অন্য সময়ে আমার, বিশেষ করে আমি যখন নানা বিষয়ে মতামত দিয়ে যাচ্ছি, তখন মা বলতেন, নিজেকে যতই বড় ভাবি আসলে ছোট আছি আমি সে কথাটা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। মা-র এই দুরকম বক্তব্য শুনলেই আমি লড়াই বাধিয়ে দিতাম। মা উত্যক্ত হয়ে বলতেন, যত শেষা, তত খাসা ; তুমি যত মুখে মুখে কথা বলতে শিখেছ, এত ছেলেপিলে মানুষ হলো আমার এ হাতে—নিজের পেটের, ননদদের,—কেউ কখনো এমন করে নি।

মা-কে রেগে যেতে দেখলে আমি উঠে গিয়ে হয় বই খুঁজতাম, নয়ত জালের ঢাকনা খুলে বিকেলের জন্য তুলে রাখা প্যাঁড়ার পাশে পাশে ফেটে ওঠা ক্ষারের কুচি আলতো করে মুখে পুরে দিতাম। মুখটা মিষ্টি হলেই মন অমনি খুশির সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আত্মগ্লানিতে ভরে যেত। আমি বুঝতে পারতাম আমার দ্বারা কিছু হবে না। মেদিনীপুরে কী হচ্ছে, গান্ধীজী কী বলছেন। কিংবা সুভাষচন্দ্র নেতাজী নাম নিয়ে ঠিক কোন রেডিও স্টেশন থেকে কী ভাষণ দিচ্ছেন এ সব শুনবার কী অধিকার আমার। কেবল যদি আমি লোভী থাকি খাই-খাই করি একেবারে ছোটদের মতো। এ সব আত্মগ্লানি চলে যেত কুন্দ আর চামেলির কাছে গেলে। এই ঝোপ আর লতা আমি এই প্রথম দেখলাম। পাতা ছিঁড়ে গন্ধ শুঁকে শুঁকে কতবার দেখেছি চেনা গন্ধ মেলে কি না। ফুল ধরবার আগেই চলে আসতে হলো। চামেলির তো কুঁড়িও দেখতে পেলাম না। কুন্দের ঝাড় ছেয়ে কালি এল, আমরা ফিরলাম বহরমপুরে।

॥ ১৯ ॥

এই কয়েক মাসের ব্যবধানে বহরমপুর কোর্টকে দেখাচ্ছিল যেন কী অন্যরকম। স্টেশনে কী সাইকেল রিকসার পূর্ণ আধিপত্য এসে গেছে? ঘোড়ার গাড়ি সব উঠে যায় নি বটে কিন্তু রিকসার দিকেই যে সবার দৃষ্টি। রিকসাওয়ালারাই গাইছে, রিকসাওয়ালারাই বাজাচ্ছে।

ইষ্টিশন থেকে সাইকেল রিকশায় চেপে এবার যখন দিদি আর

আমি, বাবা আর মা এইরকম ভাগে ভাগে ফিরে এলাম মফঃস্বলের বাড়িতে আরো একবার, তখন জানি, কলকাতা থেকে আর পালাচ্ছে না কেউ। বরং কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পালা এখন —যুদ্ধকালীন কাজের খোঁজে। এমন কি খাবারের খোঁজে। খাবারের খোঁজ? শহরের শুকনো রাস্তায়? শোনা গেল, কলকাতাতে লোক মরে যাচ্ছে খাবারে ভর্তি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে, তবু হাত বাড়াচ্ছে না কোনো খাবারে, লুঠ করছে না সুখী গৃহস্থের ভাঁড়ার। লঙ্গরখানার গল্প বেরোচ্ছে একটি দুটি।

অনেকদিন পরে ফিরেছি তাই মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন অনেকে। কলকাতার আগন্তুক রয়ে গিয়েছিলেন যাঁরা, কেননা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষানিয়ামকের অফিসের মতো অমনি আরো কিছু কিছু অফিস এখনো ছিল এখানে, সেই সব আগন্তুক পরিবার ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন কলকাতায়। তাঁদের এক গৃহিনী বেড়াতে এসে রেকাবী থেকে পান তুলে নিয়ে মুখে দিতে দিতে বললেন, কিসের না খেয়ে মরছে? কে বলে এসব কথা? খেয়ে মরছে, দিদি, খেয়ে। আমাদের বাড়ির সামনেই তো ওখানে লঙ্গরখানা খুলেছে, এক পাথর খিচুড়ি খেয়ে গেল, আবার আসবে খেতে, পেট ফুলে হাঁস ফাঁস, খেয়ে ব্যস তখুনি—তখুনি ঠিক কী হলো সেটা রঙ দিয়ে বলবেন বলেই তিনি কথায় যতি দিয়েছেন বুঝতে পেরেও মা ছোট করে 'হ্যাঁ' বলে থামিয়ে দেন কথাটাকে। আমি আর দিদি উঠে যাই ঘর থেকে আস্তে আস্তে। ঠিক করেছিলাম কলকাতার এই সব গিন্নীরা এলেই এর পর থেকে উঠে আসব, পান সেজে দেব না একটাও। ক্ষুধা নিয়ে যে ব্যঙ্গ করে, তার মুখে পান দিতে আছে?

তখনো আমরা জানতাম না, খাবারের সন্ধানের সে আর্তি মফঃস্বলেও এসে বাজবে, কদর্য কঠিন হবে প্রতি গ্রামে। দুগ্ধবতী

গাভী শীর্ণ হয়ে যাবে খাদ্যাভাবে, তাদের বাঁচাতে পারবে না কেউ, কিন্তু তবু বাড়ির দুধটা আছে বলে তাদের নির্ভর করে বাঁচতে চাইবে নিরুপায় মানুষ। আমাদের বাড়িতে খুব দুঃসময় চলছিল। অল্প কিছুদিনের জন্য, কিন্তু মনে হয়েছিল সেই কতকাল। সেই অকালের ভিতর দিয়ে এসে আমি পৌঁছে গেলাম কলকাতার দক্ষিণে।

যুদ্ধ তখন থেমে যাবে বলেই খুব জোর এক পশলা চলছিল। জনযুদ্ধবাদীরা অনেক কথা বলে যাচ্ছিলেন। না, তখনো 'পণ্ডিতজী, ভাবিয়া দেখুন' প্রকাশ হয়নি, নেহেরু তখনো কারাগারে। কিন্তু কথা উঠছে পড়ছে নানারকম। সুভাষচন্দ্র মিসগাইডেড? বটে! কে বলে রে?—বলে রাগারাগি করে যাচ্ছেন কারা। তাঁদের আবার ভিন্ন পক্ষ ফ্যাসিবাদী বলে ডাক দিয়ে যাচ্ছে। এত কাণ্ডে কিন্তু কলেজের মেয়েদের চমক দিতে পারে নি। না হয় হলোই সুভাষচন্দ্রের পরিবারের মেয়েরা তাদের সহপাঠিনী। এস. এফ-এর মহিলা সদস্যরা তেজের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা দিচ্ছেন তো দিন না, মেয়েরা দল বেঁধে মনের সুখে হাজরা পার্ক থেকে কিনে আনা চীনে বাদাম খায়। মোহন সিরিজ পড়ে সুমিত্রা বনানী সন্ধ্যারাণী নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করে। জ্যোতিপ্রকাশ দেখা দিয়েই কেন মরে গেল। ইশ্! ক্লাস কক্ষে তাদের মন নেই এমন নয়। কোন স্যার পাম্পশু পরেছেন (তবে কি তাঁর নতুন বিয়ে হলো), আর কোন্ স্যারের পায়ে চটি জুতো এ নিয়ে তাদের আলোচনা দীর্ঘ হয় বটে কিন্তু স্যারেদের পড়ানোর ভঙ্গী নিয়েও কথা চালাচালি হয় না তা নয়। ভোরবেলার কলেজ তবু আমার জন্য সাজ পোষাকের পারিপাট্টি থাকে যেন সন্ধেবেলার সফরের মতো। এ শহর যে কাঁপছে, এ দেশে যে একটা কিছু হতে চলেছে তা এই দীর্ঘকুন্তলা, সুবেশিনীদের দেখলে ঠাহর হয় না।

প্রত্যেকটি বড় ক্লাস যেহেতু কয়েকশ ছাত্রীর সমষ্টি ছিল, ক্লাসগুলি অসংখ্য ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। আমি যে দলে পড়ে গিয়েছিলাম সেখানে আমার কাজ ছিল গান শোনানো আর গান শোনা। আমার দ্বারা এ ছাড়া আর কিছু হবে না এ আমি বেশ বুঝেই গিয়েছিলাম। কিন্তু বাকি জগত যাকে বলে সেটা এ বিষয়ে ঠিক একমত হয়ে উঠছিল না কিছুতেই। কেউ না কেউ কোনো না কোনো ফন্দীতে সততই আমাকে গড়ে পিটে তোলার চেষ্টা করছেন এইটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমার চলাফেরা ছিল এখন দক্ষিণ কলকাতার কয়েকটি চিহ্নিত পথে। উত্তরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি দেখতে পেতাম দক্ষিণে ঠিক পাড়া বলে কিছু নেই। উত্তরের মানুষদের চোখে তো কালীঘাট পেরিয়ে গেলে দক্ষিণের সবটাই ছিল বালিগঞ্জ, আর বালিগঞ্জ মানে যে কী, সে কি আর বলে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, এ শুধু অনুভবে পাবার জন্য।

দুই আর দুইএর এ নম্বর দেওয়া সবুজ দেহ বাস কালীঘাট থেকে শেষ স্টপের সীমা নিয়ে এল সাদার্ণ এভিনিউ-এর অনেকটা ভিতরে, আর দোলের দিন ভিড় করে উত্তরের তরুণ বালকেরা এল দক্ষিণাবর্তে। মুশকিল সেদিন দক্ষিণের পথে চলা মেয়েদের। যতদিন না নিয়ম করে দোলের দিন দুপুর একটা পর্যন্ত গাড়িঘোড়া সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ততদিন উত্তরের এই বাৎসরিক আক্রমণ দক্ষিণকে সইতে হয়েছে।

দোলের দিন আমি একেবারে বেরোতাম না, কিন্তু অন্যদিন সাদার্ণ এভিনিউ-এর চওড়া পথ ধরে খানিকদূর যেতেন ছোটবউদিদি, সঙ্গে যেতাম আমি, বিকেল থাকতে থাকতে। অনেকে হাঁটত সে পথে। লেক হাসপাতাল ছিল সাদার্ণ এভিনিউ-এরই প্রান্তে। লেকের কাছে মিলিটারী ক্যাম্প রাখায় সাধারণ মানুষের যতটাই

অসুবিধা হয়েছিল লেক হাসপাতাল এখানে থাকায় ঠিক ততটা তো বটেই বরং কিছু বেশি সুবিধাই হয়েছিল সকলের। বহু লোক যেত সেখানে দেখাতে, সেখানে রয়েছে এমন আত্মীয় বন্ধুকে দেখতে। ছোড়দাদার সংসারের হাওয়া ছিল দক্ষিণের মতোই স্বচ্ছন্দ, খোলা। ছোটবৌদিদির সঙ্গে সঙ্গে দোকান বাজার ঘোরা অভ্যাস হয়ে গেল আমার। লেক মার্কেট ও রাসবিহারী এভিনিউ-এ নতুন সাজানো বাঙালী দোকানগুলি রীতিমত চেনা হয়ে গেল। লণ্ড্রিতে কাপড় দিতে সংকোচ হয় না একটুও। হঠাৎ দরকার মতো কয়লা কিংবা মিলের কাপড়ের জন্য লাইন ধরতে হবে শুনলে ভয় ভাবনা কিছুই করি না।

ফার্স্ট ইয়ারের শেষদিকে বাবা মা সকলেই যখন সংসারের গতিকে ফের কলকাতায়, কলেজে ওয়াকাই-এর কথাটা শোনা গেল। সিআই "কাই"? কী ওয়াকাই? কোন ওয়াকাই? সবজান্তা মেয়েরা বলে, খুব বদনাম ওদের। ওরা কি চাকরী করে নাকি? ওরা তো সব যত অ্যাংলো মেয়েগুলো—সোলজারদের ইয়ে। উইমেনস অকসিলিয়ারি কোর-এর এই কুখ্যাতি ছাপিয়ে যাতে কতকটা নাম ছড়ায়, কিছু মেয়ে কাজে যায় এজন্য এদের তরফ থেকে, এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হলো। বিষয়ঃ মেয়েদের স্বাধীন জীবিকা।

ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর ব্যাপারটা তখন জোর চালু। সেই সূত্রে যিনি মেজর, আমাদের তিনি লজিক পড়াতেন। তাঁর কেমন মনে হলো লজিকে যেহেতু আমি যুক্তিতর্কের ভুল ধরে দিতে পারি, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার আমার বিশেষ এক্তিয়ার রয়েছে। যেমনই এ কথা মনে হওয়া অমনি তিনি আমাকে রীতিমত নির্দেশ দিয়ে বললেন, বাড়ি থেকে লিখে এনে দেবে, পরশুই সকালে যেন হাতে পাই।

কী হাতে পাবেন? লেখা? তাও ইংরেজী প্রবন্ধ! আমি এগোব নিজের মুখ হাসাতে? কিন্তু কী করে এই মেজর লজিকের মাষ্টারমশাইকে ঠেকাই? পরামর্শ চেয়ে দাদার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দাদা উৎসাহ দিয়ে বললেন, কেন দিবি না কেন যোগ প্রতিযোগিতায়? দে, আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি।—আমার হয়ে লিখবেন দাদা। একে বলা যেত তঞ্চকতা। কিন্তু আমাকে তো মাষ্টারমশাই বলেছেন বাড়ি থেকে লিখে আনতে। এ কি বাড়ি থেকে লিখে আনা হচ্ছে না? কাজেই আমি লেখাটা দিয়ে দিলাম তাকে। তিনিও নিয়ে নিলেন। তারপরে যথাসময়ে হল্ এগু এগুারসনের সামনের মাঠে এক অনুষ্ঠানে সে প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণার ব্যবস্থা হলো। দিদি আর আমি কলেজ থেকে নিয়ে গেলে যেতে পারি, বাবা একথা জানিয়ে বেরিয়ে গেছেন। নিয়েও গেছেন আমাদের কলেজ থেকেই। শুনছি ফেরাটা ফিরিয়ে দেবে কলেজের দরজা পর্যন্তই।

কলকাতার মাঠে সন্ধ্যা নেমে আসছিল, দেখে ভাল বাসবো না দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে ভয় পাবো? বারবার খবর নিচ্ছিলাম বেজে গেল কটা? কত কী যে বক্তৃতা হাততালি চলছিল কেবলই, আসল কাজ শুরু হয় না, শেষও হয় না। শোনা গেল লিখিত প্রবন্ধগুলির ভিতরে বেছে নেওয়া হয়েছে চারটি লেখা। সেগুলির বক্তব্য নিয়ে বক্তৃতা দিতে হবে লেখিকাদের। বলার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পুরস্কার পাবে কে কে। নির্বাচিত চতুর্থ নাম আমার—মানে, আসলে দাদার। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লিখেছেন তিনি, আমি কি পড়েছি না কি কী তার বক্তব্য যে তাই নিয়ে এই মেঠো সভায় বলতে পারব? শীতের মধ্যে ঘেমে যেতে লাগলাম আমি। 'কর হে আমার লজ্জাহরণ' খুব গাইত তখন গানটা সবাই। আমার কানের ভিতরে সুরটা ঘুরছিল। কিন্তু লজ্জাহরণ হবে এমন কোন্ আশা

ছিল না। আমি ইংরেজী বলতেই পারতাম না। দিদি বলেছিল, তুই তো পারিস কত, পারবি ;—কে জানত, দিদিও ভরসা করে বসে আছে।

তৃতীয় লেখিকা অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমি, না। আমি পালাই নি। কানের মধ্যে কেমন বিশ্রী ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগলেও চাঁদোয়ার ফাঁক দিয়ে সামনের চিলতে আকাশের দিকে চেয়ে ইংরেজিতে না বলার জন্য ক্ষমা চেয়েছিলাম। বাংলায় বলেছিলাম যে মেয়েদের বাইরে কাজ করতেই হবে। মেয়েদের ছাড়তে হচ্ছে বলে মা ভাবনা করলেও, আড়াল করে রাখতে পারছেন না বলে বাবা ভয় পেলেও, মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলতে হবে। এখন চলবার পথ এত খারাপ, কারো কাঁধে ভর দিয়ে সেখানে চলা অসম্ভব। আর তো আমাদের আগের দিন নেই। আগে কি কখনো রাজপথ থেকে বৃথা অনুসন্ধানী মানুষের শবদেহ অপসারিত করতে হয়েছিল? শহরের আলোয় ঠুলি পরানো হয়েছিল। এত লাইন করে দাঁড়াতে কি দেখেছি আমরা কখনো আমাদের ভাইদের এর আগে? সমস্ত দুঃখ দুঃসময়ের সব দায় ভাইদের দিয়ে নিজেদের নিরাপদ রাখা আর আমাদের সাজে না। আমাকে, আপনাকে, সবাইকে এসে স্বাধীনভাবে সারিবদ্ধ হতে হবে। অনেক ভিড়ে, সকলকে নিয়ে ভবিষ্যৎ তৈরী করে নেবার দায় এখন মেয়েদের। গবাক্ষে বসে সময় কাটানোর কাল আর নেই।

জনসমক্ষে এই প্রথম বলার পরে দ্বিতীয় পুরস্কারের পঞ্চাশ টাকা নিয়ে দাদাকে দিতে চেয়েছিলাম, এটা তোমারই তো টাকা দাদা।

দাদা বললেন, দূর, লেখার জন্যে তো দেয়নি, ও তো তোর বক্তৃতা শুনে দিয়ে দিল বুঝতে পারছিস না? মা খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। প্রাইজ দেবে তো বেশ দাও, ভাল বই দাও, কি

একটা মেডেল টেডেল। মেয়ে নিয়ে এসেছে টাকা, গড়ের মাঠ থেকে, তাও কি না বক্তৃতা দিয়ে। দিন কাল কী পড়ল!

সেজদাদা তক্ষুনি একটা ন্যায্য খরচের পথ দেখিয়ে না দিলে তাঁর বিরক্তির উপশম হতে বোধ হয় দেরি হতো। সেজদাদা বললেন, এই তো রঙমহল ফাংশনের টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গেল, দে, সকলের জন্যে অ্যাডভান্স টিকিট কেটে আনি।

বাবা পেশেন্স খেলতে বসেছিলেন। আমাদের ফিরতে দেরি দেখে যে উদ্বিগ্ন রাগ হয়েছিল তাঁর, তা তখনো তাঁর মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল। দিদির কাছ থেকে বিলম্বের কারণ, সভার বিবরণ শুনতে শুনতে তাস মেলাতে চেষ্টা করছিলেন তিনি। একসময়ে হঠাৎ আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী? কি বক্তিমে দিয়ে এলে?

আমি বললাম, মেয়েদের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

শুনে বাবা আস্তে নিজের গলা ঝেড়ে নিলেন একবার, তারপর একে একে ভেস্তা খেলার তাস তুলে ফেলে আর একবার ভাঁজতে লাগলেন মন দিয়ে।

॥ ২০ ॥

মহাযুদ্ধের শেষ পর্বে কলকাতাতে কষ্ট ছিল না, ক্লান্তি ছিল না, এ কথা বলবো কী করে। ঢাকুরিয়া লেকের জল আর তার তীরের সবুজ যতই না মন উতলা করে দিক, লেকবাজারের মুখোমুখি বসনালয়ের লোহার দরজায় ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে থাকা কাপড়ের কনট্রোলের লাইন কি দেখিনি? আর সেই বাঁধাদরের দোকান

থেকে দশসের মাপা কয়লা ধরার অভিজ্ঞতা? সে সবই ছিলো। কিন্তু বয়স ছিল অল্প, ভারি একটা দুরাশা ছিল কেমন তখন, কী যেন হবে, হবেই। ক্লান্তি, কষ্ট, কিছু নয় ও সব।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মনোরমাদি আমার এক দাদার সাময়িক কাজে সহকর্মিতার সূত্রে এসে এসে দাঁড়াতেন মাঝে মাঝে। তাঁদের দু একটা ঘরোয়া বৈঠকে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। দুর্ভিক্ষে গ্রামের পাঁজর ভেঙে গেলে, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হলে মেয়েদেরই ভাবতে হয় বেশি, "কেন না মেয়েদেরই তো সকলের পাতে ভাত তুলে দিতে হয়"—কথাটা বলেছিলেন আত্মরক্ষা সমিতির কেউ। শুনে কেন আমার মনে হয়েছিল এই সামান্য কথাটাও এঁরা ঠিকমত নিজে ভেবে বলছেন না, শুনে শুনেই বলছেন, কেন, কে জানে?

চারিদিকে তখন অনেক কথা। তারই ভিতরে কেমন মনে হতো এবার আমরা স্বাধীন হয়ে যাব কি? গান্ধী নেহরু ছাড়া পাওয়ার নামেই দেশজোড়া আরেকটা আন্দোলন কি হবে না যাতে সব ছোট কথা মিশে যায় স্বাধীনতার কথায়?—নিতান্ত ছেলেমানুষী ভাবনা। তাই নিয়েই থেকে থেকে আনমনা হয়ে যাই। দাদারা এখন সবাই কোনো না কোনো কাজে লিপ্ত। তাঁদের অফিসের ভাত দেবার ব্যাপারে সাহায্য করতে হয় না কিনা তাই হয়তো আমার এমন বাইরে-যাই বাইরে-যাই ভাব ওঠে, এই ধারণা থেকে দাদা পর্যন্ত মাঝে মাঝে বলে ওঠেন, বাড়ির কাজে সাহায্যে করিস না কেন রে? —শুনে আমি জামা কাপড় নিয়ে লণ্ড্রিতে দিতে চলে যাই। কাপড় ধুতে দেওয়াও হবে, একটু ঘুরে আসাও তো হবে। একটা বিষম সুন্দর বিকেলে কী করে মানুষ একটুও বাইরে না বেরিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারে? অথচ আমার যত মুসকিল সেখানেই। গুরুজনেরা বলেন, কলেজে যাচ্ছ যাও। তার চেয়েও বেশি নড়া-

চড়ার দরকার থাকে তো ঠিক আছে। এতদিন যা বলেছি, এখন ছেড়ে দিচ্ছি তো লণ্ড্রিতে জামাকাপড় দিয়ে-নিয়ে এলে, কিংবা, আলু কিনে আনতে পারবে ঐ সংগে একটু এগিয়ে লেক মার্কেটে গিয়ে? তা যাও তাহলে। মোটের ওপর, কাজ থাকলে, বাড়ির দরকারে বেরোলে, সে একরকম মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে বিকেলবেলায় শুধু শুধু রাস্তায় রাস্তায় বেরোনো আবার কী? কাকে দেখেছ ও রকম? দুদশজনে মিলে কোথাও গেলে কারো বাড়িতে একদিন সে বুঝি।

মায়ের এ সমস্ত কথায় যুক্তি ছিলো বই কি। কী সুন্দর অবাধ, চওড়া রাস্তা দক্ষিণ কলকাতার, তবু,—লোকের বাড়ি যাওয়া, কি নিদেনপক্ষে পাড়ার দলেবলে কোথাও একটা যাচ্ছি বলে চলতে থাকা ছাড়া শুধু পথ দিয়ে হাঁটার আনন্দে কেউ হাঁটে, লোকের ব্যবহার দেখে এমন মনে হতো না তো; অথচ তখন সবে নতুন লাগানো গাছ মাথা নেড়ে নেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে, ঘাসের জমিতে তখনো সবুজ রং। সেখানে বেড়ানোর জন্যে বেড়াবেন শুধু বৃদ্ধেরা, কিংবা বাচ্চাদের গাড়ির হাতল ঠেলে দাস-দাসীরা। ছেলেরা খেলবে অবশ্য। কিন্তু মেয়েদের কেউ একা একা, বিশেষ করে কমবয়সী মেয়ে বাঙালী বাড়ির মতো ফিরিয়ে শাড়ি পরে একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছে, ব্যাপারটা এতই অবাস্তব যে এরকমটা আমি ঘটাতে যাচ্ছি দেখে রোজ রোজ তর্কাতর্কি তো বেধে যাবেই। বাধতোও তাই, মায়ের সংগেই বাধতো সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তিনিই আবার কি-এক-রকম বুঝে নিয়েছিলেন আমি একা বেরিয়ে পড়তে ভালোবাসি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়, একা বেড়াতে চাই বলেই। এই খ্যাপামির উপরে একটা সমাজ-শোভন আবরণ দেওয়ার জন্য আমার বেরোবার মুখে মা রোজ ছোটখাট বাজার দোকানের দায় দিতে লাগলেন যাতে এ নিয়ে দাদারা কিংবা অন্য কেউ কোনো প্রশ্ন

না তুলে ফেলেন। পরাশর রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি বিমনা হয়ে যা কিছু উল্টো-পাল্টা ভাবতাম তার ভিতরে আলু কিংবা ডিমের চিন্তাকে প্রাধান্য দেওয়া যেত না কিছুতেই। ফলে, বাড়িতে যে বাজার এসে পেঁছিতো তা খুব আদর্শ বাজার হতো না। কিন্তু মা তা নিয়ে কিছু বলেন নি কোনদিন।

বাড়ির ভিতরে আবহাওয়ার এই হেরফের আমাকে খুব ভাবনায় ফেলতো। এ ছিল একেবারে আমার একার ভাবনা! এ জন্য এর উত্তাপ কিছু বেশি হতো। ভোরবেলাকার কলেজে যতদিন ছিলাম, কারো সঙ্গে এমন হৃদ্যতা তৈরি হয়নি যাকে বুঝিয়ে বলা যায় সমস্যাটা কী। সেখানে শ চারেক মেয়ে অসংখ্য ছোট ছোট আড্ডার দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একাধিক দলে আমি বসেছি, উঠে এসেছি, সর্বত্রই আমার মুখোশ ছিল গাইয়ের। সাধারণত যে কেউ এসে গান করো বলে সাড়া নেবে, আর আমি হযবরল-র 'শিখিপাখা মিশি মাখা' গাইয়ের মতো কোনো চলতি আধুনিক কিংবা এমনকি ফিল্মের গান শুনিয়ে দেব, এটা মোটামুটি ধরে রাখা ছিল। যারা তখন সদ্য গীতবিতান ইস্কুলের মানী ছাত্রী তারা খেলো মনে করত সমস্ত ব্যাপারটাকে কিন্তু গলায় কাজ টাজ নিয়ে কথা বলতে ভালবাসত যারা তাদের মনে হতো আমাকে ঠেলেঠুলে কোনো একটা গানের ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতে পারলে বেশ ভালো হয়। এভাবে একটি দুটি গাইয়ে মেয়েই আস্তে আস্তে আমার বন্ধু হয়ে উঠেছিল যাদের দেখলে মন বেশ খুশি হয়, না দেখলে মন ভার হয়ে উঠে। এদের সামনে বসে গান শোনানো ছাড়া কিছু কিছু সংবাদ সরবরাহ করার কাজও আমি পেয়েছিলাম। তখন তো ফিল্মের কাগজ কি গানের জগতের চুটকি গল্প পরিবেশন করার জন্য কাগজ ছিল না কোনো। অথচ তখন খুব ফাংশন জমে এদিকে ওদিকে কোন গাইয়ে এসেই গেয়ে চলে যাবার সুযোগ পান নি বলে

উদ্যোক্তাদের উপর মেলা মেজাজ দেখিয়ে গেছেন, কোনজন আবার বহুক্ষণ বসে থেকে অন্যান্য শিল্পীর আদ্যশ্রাদ্ধ সেরেছেন মুখে মুখে—এসব গল্প ছড়াচ্ছে থেকে থেকেই। সেই সংগে বাড়ছে গাইয়ে বাজিয়েদের বিষয়ে নানা ব্যক্তিগত কৌতূহল। (আমার কেমন ধারণা আমাদের সমসাময়িক সেই সব উৎসাহী তরুণ তরুণীরাই পরে এ অভাবমোচনে নেমে গিয়েছিলেন। নানা চুটকি কাগজ দেখা দিল সেইজন্যেই। তবে, এ ধারণা ঠিক, এমন নিশ্চিত প্রমাণ আমার কাছে নেই)।

আমি ছিলাম সেই অদ্ভুত মেয়ে যে এক সময়ে নলিন সরকার স্ট্রীটে যেত, ('তবু তুই এইচ এম ভির খবর নিতিস না ? কী বোকা রে তুই ?') যার নিতান্তই সম্পর্ক সুবাদে সুযোগ হয়েছিল জানার যে বিমল গুপ্ত নামের হাস্যরসিক কমল দাশগুপ্ত আর সুবল দাশগুপ্তের অগ্রজ। এ সম্বন্ধ বন্ধনকে চাষ করা হয়ে ওঠে নি বলে সহপাঠিনীরা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও গল্পের রসে কোনো হানি হতো না। শৈলদেবীর মৃত্যুসংবাদ আর একজন নতুন খ্যাতনামা শিল্পীর ছেলে বউ, নাম যার বাণী মিত্র, এঁর পুড়ে মরবার খবর বেরোলে সংগ্রহ করে রাখার অভ্যাস ছিল আমার। এতে আমার সঙ্গিনীরা খুশি হতো। সেই খুশির সামনে বাড়ির কথা, আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা বলবো এমন ভাবনাই অপ্রাসঙ্গিক মনে হতো আমার। বাড়ির কথা কখনো বলতে আছে কাউকে ? হলোই বা তারা মিণ্টু আর অনু। —এই দুই বান্ধবীর আমন্ত্রণ রাখতে যাওয়া নিয়েই বাড়িতে দিন দুই খুব গোলমাল হল। একবার আমি দেড় দিনের অনশন ধর্মঘট করে ফেললাম।

আমার বান্ধবীরা সেবার টের পেয়েছিল কলেজে চীনেবাদাম না-খাওয়া দেখে, জল না-খাওয়া দেখে। —কী রে ? পাগল না কি তুই ? এ-মা। তা, উপোস করে থাকবে তো বাড়িতে

বসে কাঁদ। বাবা, কী জেদ মেয়ের! —বলেছিল আমার বান্ধবীরা।

—কথা দিয়েছিলি, যাসনি তাতে কী হয়েছে? আমাকেই তো দিয়েছিলি কথা, আমিই তো বলছি মেয়েদের হয়ই ও রকম। তাহলে তোমার মেয়ে হয়ে জন্মানোই উচিত হয় নি। —তারা বলেছিল।

কোনো একটা কথা দেওয়া-না-দেওয়ার কথা নয়, এটা যে জীবন যাপনের এক সাধারণ অধিকার নিয়ে লড়াই—এ কথাটা ঐ একদিনই আমি তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। উপবাসে নিজেকে খুব পরিণত, সাহসী, সবল মনে হচ্ছিল বোধ হয়। সব শুনে অনু খুব চিন্তিতভাবে বলল, এই মানসী, তুই কম্যুনিস্ট হয়ে যাচ্ছিস না তো?

আমায় তাই চুপ করে যেতে হলো। ঠিক যেমন চুপ করে যেতাম যখন ছাত্র ইউনিয়নের দিদিমণিরা বলতেন, কেন আসবে না তুমি ছাত্র আন্দোলনে? বলো? এখন তো আর চুপ করে থাকার সময় নয়? —শুনেই আমার মন বলত এখন একেবারে চুপ করে না গেলে এমন সব কথার ভিতরে আমি জড়িয়ে যাব যা আমার ভেবে ওঠা হয় নি, যে সব কথা আমি বলতে চাই না। ষোলো বছরের মন কখনো কখনো খুব ঠিক কথা বলে।

সেই সময় কলেজে কলেজে নতুন যে ছাত্র সংগঠন ফুলকি ছড়াচ্ছিল, তারই দুটি অগ্নিশিখা রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন আমাদের ঐ ভোরবেলাকার কলেজের দিদিদের ভিতরে। খুব প্রতাপ ছিল তাঁদের। ছাব্বিশে জানুয়ারিতে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হলো যেদিন, এঁদের ভিতরে অভিনয় কুশলতার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ

বিবাহিতা সেই কর্মী "ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে" আবৃত্তি করে গলায় শির ফুলিয়ে তুললেন। ঐ সব সভায় আরেকটি কবিতা খুব পড়া হতো তখন: 'রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া'। এ সব পাঠে একটা গৃহীত সুর ছিল, সকলেই সেভাবে পড়তে চেষ্টা করতেন। উচ্চারণের উনিশ বিশ ধরা যেত ঠিকই, কিন্তু চেঁচানোই যে ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশের প্রধান উপায় এ যেন সকলেই এক রকম মেনে নিয়েছিলেন। এতদিনে কি তার একটু বদল হতে পারতো না? পারতো, তেমন হয় নি। কিছু কিছু ব্যতিক্রমী আবৃত্তি শোনা যায়। নিতান্তই ব্যতিক্রমী, চেঁচানো তখনকার মতোই এখনো নিয়ম। মাঝখান থেকে বদলে গেছে বন্দেমাতরম ধ্বনিরই ছাঁদ। কেমন যেন ঝোঁকে ঝোঁকে কাহারবা ছন্দে বন্দেমাতরম বলা হয় আজকাল। আমাদের তারুণ্যে তাল ছাড়া যে বন্দনার ধ্বনি শুনেছি: বন্দে—এ—এ—এ—এ মাতরম, তা এখন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত।

চেঁচিয়ে আবৃত্তি আমার যেমন খারাপ লাগত, টেনে টেনে বন্দে-মাতরম বলতে ভালো লাগত ততখানিই। সেইভাবেই আমরা বলেছি যখন যে সভায় সুযোগ পেয়েছি ধ্বনি দেবার যতদিন না, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, আমাদের অনার্স ক্লাসে ঢুকতে যাওয়ার আগে, ফিরে আসা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর 'জয় হিন্দ' ধ্বনি আমাদের ধ্বনির বোল পাল্টে দিল। বন্দে মাতরম চলে গেল তা নয়। কেমন একটা ধারণা ভেসে বেড়াতে শুরু করলো সে সময়ে যে জয় হিন্দ ধ্বনিতে হিন্দু অহিন্দু নির্বিশেষ সর্বভারতীয়তা ফোটে বেশি। আর, শুনতে কী সুন্দর গাল ভরা, প্রাণ ভরা, 'জয় হিন্দ'।

॥ ২১ ॥

ওভারটুন হলের জাতীয় সঙ্গীত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। সে সভায় আমি প্রথম শম্ভু মিত্রকে আবৃত্তি করতে শুনি—সতেজ, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি'; আর "ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে" থেকে সুরু করে অন্যান্য স্বদেশী গানের সংগে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নবজীবনের গান।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী তাঁর স্বভাবসমৃদ্ধ স্বরে বলছিলেন তাঁদের কালে এ সব গানের সংগে কী ব্যাকুল উদ্দীপনা ও আবেগ জড়িয়ে ছিল। গান শুধু সুর-তাল-মান ছিল না। তার চেয়ে ঢের বেশি কিছু ছিল।

এখানে যাওয়ার সময়ে,—বেলা তো তখন দুপুর—উপস্থিত গুরুজন বলতে বাড়িতে ছিলেন বৌদিদি, তাঁকে বলে গিয়েছিলাম। ফিরতে আমার দেরি হয় নি, একাও যাই নি আমি, সংগে ছিল দূরাগত তুতো—ভাইবোনেদের একটি মাপসই দল। কিন্তু বাড়িতে কেউ কেউ সম্ভবত বিশ্রাম করতে শুরু করেছিলেন যে আমার প্রতি বাবার মৃদু, প্রায় আত্মগত শাসনকে তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গীতে কতকটা কড়া করে না নিলে আমার এই উঠতি বয়সের বাইরে যাওয়ার ঝোঁককে সামলে ওঠা যাবে না। আমাকে সেদিন বাড়িতে ফেরামাত্র তাঁদের মুখপাত্র যেই জিগগেস করলেন, কার হুকুমে গিয়েছিলি কতদূরে?—বাড়ির সংগে আমার একটা অঘোষিত লড়াই

বেধে গেল। অথচ এই একই কথা আরও ঢের আগে দাদামশাই বলেছিলেন আমাকে। তবু, এই একই কথা তাঁর কোনো পৌত্রের কাছ থেকে শুনতে কিছুতেই রাজি করানো গেল না আমাকে। ব্যক্তিগত দেখাশোনা, যোগাযোগ নিয়ে ছোট ছোট কথা কাটাকাটি-গুলি চলছিলই, এখন থেকে খণ্ড যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা যেতে লাগল। এই সেদিন পর্যন্ত যে-দাদাদের পায়ে-পায়ে ঘুরে বেড়ানোই ছিল আমার প্রধান কাজ তাঁদের গল্পে আমি যোগ দিতে যাই না, জানি তর্ক উঠে যাবে ঠিক।

গুরুজনেরা আমার ওপরে বন্ধুদের, বিশেষ করে দুটি একটি বন্ধু ও বন্ধুস্থানীয় আত্মীয়ের, দুষ্ট প্রভাব দেখতে পাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় আমাদের বাড়ির মতো বাড়িতে কী হতে পারত? অবশ্যই বিয়ের চেষ্টা। সে কথা একেবারে কোথাও ওঠে নি তা নয়। আমার মা তো এর ঢের আগেই আমার দিদি বিয়েতে রাজি হচ্ছে না দেখে আমাকে পার করে দেওয়ার কথা তুলেছিলেন আপন মনেই। —থাকবে একটি আমার কাছে। সব মেয়েকেই পর করে দিতে হবে তার কি মানে আছে? তাই বলে দুটিকে তো বসিয়ে রাখা যায় না। তোকেই দিয়ে দেব বিয়ে। কত লোকে দেয় অমন।

এ সব আত্মগতভাবে বলতে বলতে যদি সত্যিই একদিন ঠেলা দিয়ে তিনি মন্ত্র জপিয়ে আমায় পরের ঘরে পার করে দিতেন, তাহলে সম্ভবত আমি সেই ঘরেই হাত পা ছেড়ে বসে থাকতাম। কেন না বাকবিতণ্ডা করে বেড়ালে কিংবা বই পড়ে গেলে হবে কি, ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত নিজের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আমার ধারণা একেবারে এলোমেলো ছিল। আমি এই কখনো বড়দার কাছ থেকে জার্মাণ ভাষা শেখার বই পেয়ে তাই পড়তে পড়তে একেবারে জার্মানীতে সুভাষচন্দ্রের কাছে চলে যাই, তাঁর হয়ে এর-ওর-তার সংগে জার্মাণ

ভাষায় কথা বলি মনে মনে, কখনো আবার সংগীতশিক্ষার আসরে গান শিখে গাইয়ে হয়ে উঠি, কখনো কখনো আইন শিখে সমস্ত অন্যায় কাজের প্রতিবিধানে ওকালতিতে নেমেও যাই। কলেজে পৌঁছে এ সমস্ত এলানো ছড়ানো উচ্চাশার গণ্ডিগুলিকে গুছিয়ে আনছিলাম। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবনায় স্পষ্টতা আসে নি তো একটুও। একটা কিছু হয়ে তো উঠবই, এ কথাটাই ভাবি আর বলি।

মা আমার এই নিরুদ্দেশ উচ্চাশার খবর পেলেই বলতেন, ঠিক আমাদের ছোটবেলার অবলা হয়েছে। ও অবলা বাসন মাজবি? —না, আমি বড় কাজ করবো। ও অবলা, রান্না করবি? —না, আমি বড় কাজ করবো। বড় কাজটা কি তার নেই ঠিক।

আমি বসে বসে বই পড়তাম। যে বড়দাদাকে এক সময়ে কেবল ভয়ই করতাম, তাঁর নির্দেশ নিয়ে সময়কালে না-শেখা ইংরেজী একটু করে নিজে নিজে লিখতে শেখার চেষ্টা করতাম। কিছু এগোচ্ছেনা টের পেয়ে ভিতরে ভিতরে নিজের উপরে রেগে উঠতাম, সে রাগ প্রকাশ পেত প্রায়ই বাড়ির ছোটদের সংগে ব্যবহারে। ঠেলেঠুলে এখন আমাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা যেত না আর। এখন তাই কালো হলেও কে কোথায় আমাকে বিয়ে করে ফেলবার কথা ভেবেছে এ নিয়ে ছোট ছোট কথা আমার কানে তোলার যে কোনো মানে নেই, সবাই জানতেন। মেয়ে দেখানো ছাড়া কি বিয়ে হয়? মেয়ে দেখাদেখিতে আমায় রাজি করবে কে, যে-রকম তেরিয়া হয়ে উঠেছি আমি এর ভিতরেই! এ সব কথা হাসিচ্ছলে বৌদিদিদের কেউ কেউ তুলতেন 'বড়রা কী ভাবেন' এই পর্যায়ের আলোচনায়। তারপরে সে কথা হারিয়ে যেত। আমার দিন কাটতো এলোমেলো. চেষ্টাতে আর ভাবনায়। সে সমস্ত বিচিত্র ভাবনার ভিতরে আবছা-ভাবে প্রেমের কোন স্বপ্ন একেবারে জায়গা পেত না, তা নয়, কিন্তু তার পরিসর ছিল নিতান্তই ছোট।

প্রেমের কথা বলতে আমাদের বিষম রকম মানা ছিল বলেই এ নিয়ে অনেক উৎসাহ দেখেছি আশে-পাশে, দেখেছি বিবাহিতা সহপাঠিনীদের অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে মেয়েদের বসে যেতে। তেমন কিছুই ছিল না আমার। এর কারণ অবশ্য এই নয় যে আমি একান্ত মনে ভক্তিযোগ পাঠ করছিলাম। কিংবা কোনো স্বভাবজ বৈরাগ্য আমাকে অধিকার করেছিল। আসলে, কিশোরীকালে যে সময়ে এক ধরনের প্রিন্স চার্মিং-এর চিন্তায় মন ভরে যায়, সেই বয়স থেকেই আমি একরকম 'রূপ না দিলে যদি বিধিহে' ভাবে ভাবিত ছিলাম। শুধু 'পূজার তরে হিয়া'-র ব্যাপারটা আমার মন টানতো না তেমন। প্রিন্স চার্মিংরা মগ্ন থাকবেন সুন্দরী নারীদের স্বপ্নে, থাকুন। আমি শুধুশুধু সেখানে হিয়া ব্যাকুলিয়া দাঁড়াতে যাব কোন দুঃখে? এ জন্য আমি সাজসজ্জা করার ব্যাপারে একেবারে বিমুখ হয়েছিলাম।

মেয়েদের নিয়ে মুশকিল হচ্ছে সাজলেও তাদের বিষয়ে যেমন যেমন কথা ওঠে, একেবারে না-সাজলেও আবার তেমনি আলোচনা চলে। মামাবাড়িতে কোনো একটা বিয়েতে আমি অমনি চলে গেছি, আমার এক মামীমা মা-কে বললেন, ওমা, দিদি দেখি মাইয়ারে সাতবুড়ীর এক বুড়ী সাজায়ে আনছেন।

মা বললেন, কি করব, বড় হয়ে সব নিজের ইচ্ছে। মোটে সাজতে চায়না।

আমার এক মামা-স্থানীয় গুরুজন তখন আমাকে জেরা করতে সুরু করলেন, কিরে তুই গয়না পরবিনা ক্যান? অনেক গয়না দিলি তবে পরবি? অ্যাঁ? ইচ্ছেটা কি তোমার খুলে কও।

এ রকম প্রশ্নোত্তরপর্বে ক্রমেই আমার নীরবতা তীক্ষ্ণবাক্ হয়ে সাধারণত শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাত। তার জের কোনো না কোনো সময়ে মা আর আমার এক পশলা কথাবার্তার ভিতরে চলে আসতো।

বাবা এ সবের ভিতরে প্রকাশ্য হয়ে উঠতেন না আর। কিন্তু আড়াল থেকেই কোনো একরকমভাবে আমি অনুভব করতে পারতাম এই টানাপোড়েনে জড়িয়ে আছেন তিনিও। এখন বাড়ির সংগে আমার বিবাদ কেবল ছোটখাট ব্যক্তিগত ইচ্ছেঅনিচ্ছের ঝগড়া নয়। এখন বিসংবাদ যেন আমি কী হয়ে উঠবো, কিছু হয়ে উঠবো কিনা এই প্রশ্ন নিয়েই।

এ সব গোলমেলে কথা কেন তোমার মনে আসে এ নিয়ে মা মাঝে মাঝেই কথা বলতে চাইতেন! ছোট ফ্ল্যাটবাড়িতে পা ফেলতে গেলেই যেখানে কারো না কারো গায়ে পা পড়ে যায় সেখানে নিভৃত বাক্যালাপের সুযোগ বড় কম মেলে। নেহাৎ দুপুরে ঘুমের অভ্যাস ছিল না মায়ের। আর আমিও দুপুর বেলায় নিজের কোণটিতে বসে কিছু একটা পড়ার কিংবা লেখার চেষ্টা করি, তখন তিনি বসতেন এসে আমার খুব কাছে। —অত গুচ্ছের পড়ে কী হবে? —এই প্রশ্ন দিয়ে কথা শুরু হতো তাঁর প্রায়ই। খুব মনের মতো প্রশ্ন ছিলো তাঁর এটি।

গুচ্ছের পড়া নিয়ে মা খুশি ছিলেন না তো কোনদিন। সম্প্রতি অন্যেরাও কেউ কেউ এর উপযোগিতায় সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। কলেজে ঢুকেই তো রুক্ষ হয়ে যাচ্ছি আমি? বড় হয়ে ওঠার সংগে সংগে আমি প্রত্যহ যেমন মসৃণ করে আটার রুটি বেলে ফেলতে শিখছি তেমনি মনটাকেও মোলায়েম নিভাঁজ করে তুলে ফেলতে পারলে তো হতো? তা নয় মানুষের অধিকার নিয়ে উদ্ভট সব তর্কবাজি। —আদার ব্যাপারীদের জাহাজের খবরে কাজ কি? —বলতেন মা।

—জাহাজের খবর নিতে ভাল লাগে। সেই ভালো লাগার জন্যে। কাজে লাগাটাই সব? —আমার পাল্টা প্রশ্নের চেহারা দাঁড়াতো এই রকম। মায়ের জবাব তৈরীই থাকতো। কাজই

সব। কাজের জন্যই মানুষ সংসারে আসে, হাসে, কাঁদে, কাজ সেরে চলে যায়। মেয়েদের কাজের ক্ষেত্র যে কোথায় এ কথার উল্লেখ করতেও তিনি ভুলতেন না। আমি জিগগেস করেছি কী করে তিনি জানলেন? 'আমার তো মনে হচ্ছে প্রত্যেক মানুষেরই জেনে নেওয়া উচিত তার কাজের ক্ষেত্র কী। সকলের কাজের ক্ষেত্র যদি এক হবে তো সমস্ত মেয়েকে একেবারে এক রকম তৈরি করে ভগবান পাঠান না কেন? এই যে মা-রই এই মেয়েকে অন্য রকম করে পাঠিয়েছেন তিনি যাতে মা মুশকিলে পড়ে যাচ্ছেন, এর ব্যাখ্যা কী?

এভাবে আমাদের তর্ক গড়িয়ে যেত। থেকে থেকে, থেমে থেমে। কখনো মা রাগ করতেন, কখনো বা করতেন না।

আমার মা যখন শান্তভাবে বলতেন, তুমি মা কম বয়সেই খুব জ্ঞানী হয়েছ। তার মানে ভগবানের আশীর্বাদ তোমার উপরে রয়েছে। তুমি মানো চা-ই না মানো। কিন্তু সংসার তো চিরদিন এভাবেই চলেছে, সেখানকার রীতি নীতি তোমায় দেখে মেনে চলতেই হবে। —তখন তাঁর কথা থেকে আমি ধরতে পারতাম, জ্ঞান আর কর্মে একটা চিরবিচ্ছেদ এঁদের অভিপ্রেত। কিংবা হয়তো আরো বেশি? পাছে এ দুয়ে গোল বেধে যায় এ ভাবনায় জ্ঞানের পথকে বন্ধ করে দেওয়াই হয়তো এঁরা শ্রেয় সাব্যস্ত করেন? নইলে ছোটবেলায় লেখাপড়া শিখেছি যে-মায়ের কাছে, তিনিই আজ আমাকে বইয়ে নিমগ্নচিত্ত দেখলেই কেন বলবেন, অত বই পড়ে কী হয়?

॥ ২২ ॥

বাইরে তখন একদিকে যুদ্ধ শেষ হয়-হয় করেও ফুরোয় না। ওস্তাদের শেষ রাত্তিরের মার মারবার জন্য আণবিক অস্ত্র কে কী কৌশলে বানাচ্ছে তা আমরা জানতে পাই না তো,—আমরা কেবল পাই একটু খবর এখানে, একটু খবর সেখানে। বেতারের বে-আইনী কেন্দ্রে নানা যান্ত্রিক শব্দের ভিতর দিয়ে সেই-যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু-র গলা শোনা গিয়েছিল, তা-ও স্তব্ধ।

অন্যদিকে দেশের ভিতরে লীগপন্থী সবুজ, সাম্যবাদী লাল, জাতীয়তাবাদী ত্রিবর্ণ পতাকার সঞ্চালন। ছেচল্লিশ সালের মার্চের মাঝামাঝি খুলনা যাওয়ার পথে এইটা আমার হঠাৎ খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়লো।

খুলনাতে যাবেন আমাদের অবসরপ্রাপ্ত আত্মীয়দের অনেকে, যাবেন আমাদের বড় জামাইবাবু,—খুলনার পরিচয় ছিল আমার কাছে কতকটা এই রকম। ইদানীং মায়ের মা-মরা নাতনী এসে আমাদের আস্তানায় থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে শুরু করায় দক্ষিণ কলকাতার এই ফ্ল্যাট বাড়িটির সংগে খুলনার ডাক পথে যোগাযোগ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবারে গুটিকতক কলেজী পরীক্ষা পর পর পড়ে যাওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে কয়েকদিন ছুটি রইলো ঠিক আমাদের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরই। মামার বাড়ি ছেড়ে আসা খুলনাতে গেলেন ছুটি কাটাতে।

সেই সংগে যাওয়ায় আমার খুলনাকে চাক্ষুষ দেখা হয়ে গেল দেশ-বিভাগের আগে।

কে জানতো তখন দেশবিভাগ হবে! দেশবিভাগের কী মানে। "লড়কে লেঙ্গে"র খুব একটা ক্ষীণ সুর আমাদের সমীরের আধো-আধো উচ্চারণে নারায়ণগঞ্জে যখন শুনেছিলাম, বাচ্চাদের খেলার লড়াইয়ের ব্যাপার বলেই গণ্য করেছিলাম তাকে। কিন্তু না। এবারে রেল লাইনের ধারে ধারে যে সাড়াশব্দ শোনা গেল, তাতে কোনো খেলার ছাঁদ নেই তো? বেশ কড়া ঝাঁজের দাবী স্পষ্ট অনুভব করা গেল পতাকাধারীদের বাক্যে-ব্যবহারে। উনিশশো পঁয়তাল্লিশের শেষ থেকে কিছু কিছু জমায়েতে যেতে শুরু করেছি, উত্তেজিত জনতার বাক্যাংশ থেকে অল্প অল্প মানে বের করে নিতে পারি। কেবলি ক্রুদ্ধ গুঞ্জনে কান ঠেকে ঠেকে ফিরে আসে না। রেল লাইন ধরে গেলে যা শোনা যায় শহরের ভিতরেও তার সাড়া মেলে না কি?

মেলে। তবু খুলনার ভদ্রলোক জনসাধারণ সম্পূর্ণই নিরুদ্বিগ্ন ছিলেন।

—হাঁকতিছে হাঁকুক। মেজরিটি থাকলে তবে তো সে জায়গা পাকিস্থানে নেবে। খুলনেতে মেজরিটি কার? —আমার বড় মামা আমাকে খুব বিশদভাবে বোঝালেন। —হবে না হয়তো কিছুই। ইংরেজ গো যা মতলোব তাই করবে। তবু সাবধানের মার নাই। তোমার বাবারে গিয়া কবা, সময় থাকতি থাকতি য্যান খুলনেয় একখান বাড়ি করেন। সত্যি সত্যি অগো দাবী মিটৈতি গেলি তো তোমাদের বহরমপুরের বাড় যাবে আনে পাকিদের হাতে। আর এ ছাশটা কি সুন্দর দেখিছ?

খুব সুন্দর ছিল খুলনার রূপসা নদী, খোলা পথ ঘাট, পার্ক। বহরমপুরের তুলনায় স্পষ্টতই ঢের হালের শহর খুলনার চেহারায়

তখন চেকনাই ছিল, ছিল পরিচ্ছন্নতা। খুলনাতে আমার নিতান্ত অল্পদিন থাকা হলো। আমরা যখন আসি, বাবা গিয়েছিলেন দাদুপুরে। দু'চারদিনের মধ্যেই ফিরে সেজদাদাকে পাঠিয়ে দিলেন বাবা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে কলকাতায়।

দেখা হতে বললেন, ম্যাগনোলিয়া ডেকে ফিরে যায় তোর জন্যে। কলকাতা ছেড়ে মফঃস্বলে ছুটি কাটাতে যায়? কেমন দেখলি ওদের খুলনে? —খুব গল্প করতে ইচ্ছে করছিল বাবার। বাড়িতে বসে গল্প করা কমে কমে আসছিল আমার। অত লোকের ভিতরেও বাবার একা-একা লাগতো বোধ হয় তার জন্যে। অনেকদিন পরে সেদিন আমার বাবা পেসেন্স খেলতে লাগলেন মেঝেয় পাতা মাদুরে বসে, আমি গল্প করে যেতে লাগলাম আপন মনে, যেমন গল্প কোথা থেকে বেড়িয়ে এসে, ঘুরে এসে সম্প্রতি করিনি বাবার সংগে। সেই নভেম্বরের আই. এন. এ. ট্রায়ালের প্রতিবাদী জনসভা থেকে ফিরেও না, ডিসেম্বরে সোদপুরে গান্ধীজীকে দেখে এসেও না।

দিদি ছিল আমার সংগে জনসভাতে, সোদপুরে। প্রতিবাদ দিবসের দিন আমরা পরস্পর কোনো কথা বলে যাই নি সভায় যাব কি যাব না এ নিয়ে। যেন যাব কি যাব না ভাব। কলেজে গিয়ে দেখি দলাদলি ভুলে সমস্ত কলেজ প্রায় একত্র জড়ো হয়েছে, তৈরি যাওয়ার জন্য। কোথায়? ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার আর তার পাশের রাস্তাটির নামে তখনো সামঞ্জস্য ছিল। এমন চন্দ্রের নামে পথ আর মল্লিকদের নামে পার্ক তফাৎ হয়ে যায় নি। কিন্তু সভাসমিতি কিংবা শোভাযাত্রার পরিকল্পনা এখনকার মতোই ঢিলেঢালা ছিল, এই না-ভাবা, না-চিন্তোনো আচমকা ঝাপটা দিয়ে যাওয়া। আমরা ভোরের কলেজে প্রায় কিছুই খেয়ে যেতাম না। সে কথা শোভাযাত্রা সংগঠন কর্ত্রীরা জানতেন না কি? কিন্তু সভায় যেতে হবে বলে সারাদিনের জন্য তৈরি হয়ে

আসার কোনো নির্দেশ আগের দিন জারি হয় নি, সেদিনও রওনা হওয়ার আগে এ ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব ন্যস্ত হলো না কারো ওপরে। যাদের হাত ব্যাগে বাড়তি পয়সা সর্বদাই থাকে, এমন কি সেসব সৌভাগ্যবান ছাত্রছাত্রীর পক্ষেও এরকম ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হওয়া শক্ত। আর, আমাদের কাছে ওরকম পয়সাকড়ি থাকতই না। যাই হোক, আমরা জীবনের সেই প্রথম শোভাযাত্রায় যোগ দেবার অসামান্য মুহূর্তে এসব মিছে ভাবনা একটুও ভাবি নি। সভা ফাঁকি দিয়ে বাড়িতে খেতে যাওয়ার কথা কেউ তুললে নিশ্চয় আমরা রীতিমত বিরক্ত হতাম। আমরা জানতাম না সভা বসতে তখনো ঠিক কতটা দেরি। দক্ষিণ থেকে মধ্যকলকাতায় সভাস্থলে পৌঁছে তবে দেখতে পেলাম সবই প্রায় ফাঁকা। সভার কেবল যোগাড়যন্তর হচ্ছে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাইরে ফেরিওয়ালারা চানাচুর, আলুকাবলী, ঝালমুড়ি জড়ো করছিল যেমন, তেমনি কলা কমলালেবু, ম্যাগনোলিয়ার গাড়ি, কাঠিবরফও বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। কলেজের জনাপাঁচেক যথার্থ চৌকশ ছাত্রী 'দাঁড়াও ক্রীক রোতে বেণু মাসিমার বাড়ির খোঁজ নিয়ে আসি' বলে বেরিয়ে গিয়ে ফিরে আসার সময়ে এসব রসদ কিছু কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে এল। ক্রীক রো-র বাড়ির সন্ধান অবশ্য সত্যিই আনলো তারা, সেখানে গিয়ে প্রয়োজনমত বিশ্রাম করা যাবে, ব্যবহার করা যাবে কলঘর এবং ফোন। আমরা সেখান থেকেই ফোন্ করলাম আমাদের প্রতিবেশী ফোনবন্ত আত্মীয়ের বাড়িতে। আমরা দু বোনে এসেছি সভায়। তাঁরা কি একটু বুঝিয়ে বলবেন বাবা-মাকে। যাতে কেউ ভাবনা না করেন?

ফোন সেরে ফিরে গিয়ে দেখি ওয়েলিংটন স্কোয়ার একেবারে ভরে গেছে লোকে আর নানা কলেজের ছাত্রসংসদ-পতাকায়।

সভার এপাশ থেকে ওপাশে নানা কোণে দেখা যাচ্ছে লাল পাগড়ীও।

পরবর্তিকালে পুলিশের লাল পাগড়ী কেড়ে নিয়ে আমাদের স্বাধীন দেশে কাজের কী সুবিধে হয়েছে কে জানে, দেখার শ্রীছাঁদ কমে গেছে অনেক এতে সন্দেহ নেই। তখন মাঠে পুলিশ এলো মানেই ছিল মাঠে রং এলো, এবার সোজা হয়ে বসো, ভেবে নাও কী কী হতে পারে কিংবা পারে না। আমি ধরে নিলাম বেশ গোলমাল হবে।

কিন্তু কোথায় কি রকম গোলমাল হবে সেটা আমি ধরতে পারছিলাম না। যদিও তখন ঠাণ্ডার সময়, দুপুরের রোদ চড়া হয়ে উঠেছিল। যতটা শৃঙ্খলা থাকলে সভার কার্যক্রম সভাস্থলের যে কোনো প্রান্ত থেকেই পরিষ্কার ধরতে পারা যায় সেরকম গোছের চেহারা দেখা যাচ্ছিল না। একটু একটু করে উত্তেজনা বাড়ছিল। একজন করে বক্তা বলছিলেন তার মাঝখানেই মাইক্রোফোন কখনো হঠাৎ থেমে হঠাৎ প্রায় সাইরেনের মতো কোঁ শব্দ করে আমাকে বিহ্বল করে দিচ্ছিল। দাঁড়িয়ে-ওঠা লোকজনের মাথায় মঞ্চ আড়াল হয়ে যাচ্ছিল থেকে থেকে। এমনি করে বেলা গড়িয়ে এলো।

তারপরে পুলিশের মাথা নড়তে দেখা গেল, মঞ্চের কাছে চাঞ্চল্য, রেলিংয়ের ধারে ধারে ইতস্তত ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। আমাদের দিক থেকে কেউ কেউ চাপা গলায় উত্তেজিত স্বরে 'মিটিং ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে'—বলে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। আমরা চারজন ছাত্রী,—আমরা দুইবোন আরও দুটি ছাড়াছাড়া মেয়ে—থাকি দক্ষিণের একই পাড়ায়। পরস্পর কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম আমরা। সভা ভেঙে যাচ্ছে।

খুব গোলমাল বেধেছিল সেদিন শহরে। দু-চারটে গাড়িতে, ট্রামে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পরে যানবাহন সব থেমে যাওয়ায়

বিচ্ছিন্ন-যোগাযোগ শহরে খণ্ডযুদ্ধের ভাব ঘনিয়ে এসেছিল। আমাদের আত্মীয়মহলে পাওয়া অসমবয়সী এক বন্ধু ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি এই ছত্রভঙ্গ সভা থেকে আমাদের চারজনকে প্রায়ান্ধকার হেমন্তের অপরাহ্ণে হাঁটিয়ে নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। গোলমালের নামে তখন বড়রাস্তায় শুধু পুলিশের গাড়ি নয়, সাঁজোয়া গাড়িও বেরিয়ে পড়তো। ভূতুড়ে হয়ে যেত শহরের চেহারা। মা খুব ভাবনা করছিলেন! বড় রাস্তা ছেড়ে অলিগলিতে পথ খুঁজে ফিরতে হলে আমরা পথ চিনতে পারব কি? একজন চেনামুখ পথপরিচায়ককে নিয়ে আমাদের উদয় হতে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। শহরে গোলমাল দেখা দিলে যেমন কাছেপিঠের অনেকে 'কি, সবাই ফিরেছে বাড়িতে' বলার অভ্যাসে এসে পড়েন, তেমনি কেউ কেউ খোঁজ নিতে এসেছিলেন। আমি বাবাকে সভার একটা বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি দেখে তাঁদের একজন আমাকে জিগগেস করলেন, তোরা সভায় গেলি বলে দেশ একটা দিন আগে স্বাধীন হবে, কি বলিস?

আমি মনে মনে বললাম। আপনি গেলে নিশ্চয় হতো।—আমার সেই কড়া চুপ করে থাকার মেজাজ লক্ষ্য করে বাবা বললেন, তুমি খেয়ে এখন বিশ্রাম করো গে মা।—আর লক্ষ্য না করে আমাদের আত্মীয়টি বললেন, হ্যাঁ, ঘরে বসো শান্ত হয়ে। এসব কী যে হয়েছে। প্রোসেশান মিটিং—কী হয় ওতে?

কী হয় সত্যি কি আমরা জানতাম? অবশ্যই না। কিন্তু কী করতে হবে যাতে কিছু হয়, সে কথাটা কেউ বলেন নি। আমার ঐ প্রশ্নশীল আত্মীয়টিও না, প্রতিবাদসভার বক্তারাও না। এমনকি, দেশপ্রিয় পার্কের সেই আশ্চর্য বিকেলের জনসভায় পণ্ডিতজী যা বললেন তাতেও এ প্রশ্নের জবাব মেলে নি। সে সভা ছিল অন্যরকম। উৎসবের, প্রতীক্ষার। ভিড় হবে জেনে আগে

থেকে এসে বসে থাকার সভা। আমরা বসেছিলাম তাই। ঐ যে প্রবীণ আত্মীয়টি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিটিং-এ গেলে দেশ আগে স্বাধীন হবে কিনা শুধিয়েছিলেন তিনি এবং তাঁদের বাড়ির প্রবীণরাও এসেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় সে সময়ে সমবেত জনতার ভিতরে দরকার মতো এগিয়ে আসা যথার্থ স্বেচ্ছাসেবক দেখা যেত, সমস্ত সাংগঠনিক ব্যাপার সম্পূর্ণও পাড়ার দাদাদের হাতে চলে যায় নি। আমরা বসে থাকতে যখন ক্রমে ভিড় বেড়ে উঠতে লাগল, তখন নতুন আগন্তুকের দল যাতে বসে থাকা মানুষদের ওপরে গিয়ে ভেঙে না পড়ে, ঘেরা পার্কের সাধ্য সীমার বেশি ভিড় যাতে রেলিংয়ের বাধা অগ্রাহ্য করে চাপ দেয় ভিতরে,—এই সমস্ত সতর্কতার দায়িত্ব নিয়ে নিলো স্বেচ্ছাসেবকেরা দেখতে দেখতে। সভার ভিতরে কিছু হাতপাখার আমদানি হয়েছিল, রোদের আড়াল দিতে কিংবা হঠাৎ কেউ ভিড়ে অস্থির হয়ে গেলে তাকে হাওয়া দিতে। এইসব এলোমেলো দেখতে দেখতে আমি দেখতে পেলাম জওহরলাল নেহরুকে—সেই প্রথম। আপেলের মতো গাল, কথা বলবার সময়ে তাঁর ঠোঁট খুব কোমল ভঙ্গীতে খোলে আর বন্ধ হয়, কিন্তু খুব উর্দু-ঘেঁষা হিন্দী শোনা গেল তাঁর মুখে। কলেজে তখন ইংরেজি ভাষণ শুনে খুব অল্প একটু আড় ভেঙেছে, এমনিতে বাংলা ছাড়া কোনও কথা শুনে কানের অভ্যাস হয় নি, ভেইয়োঁ। ঔর বহিনোর পরেই তাঁর বক্তব্য হারিয়ে গিয়েছিল আমার কাছ থেকে। কিন্তু তাঁর বন্দী দশায় পরে তিনি ফিরে এসেছেন, আমাদের নেতা, এই বোধ অভিভূত করে রেখেছিল আমাকে। তাঁর মেয়েকে লেখা বাপের চিঠি স্কুলের গণ্ডী পেরোবার আগে পড়েছি আমরা। তিনি আমাদের বলছেন,—কী বলছেন? তাঁর আন্দোলিত অবয়ব লক্ষ্য করতে করতে সেই অপরাহ্ণে মনে মনে এ নিয়ে অনেক আবেগ আন্দোলন করলাম আমি। আমাকে দিয়ে, আমাদের নেতারা কী

করাতে চান এ কথা অস্পষ্টই রয়ে গেল আমার মনে। একি কেবল ভাষা কিংবা ব্যাকরণের বাধাতেই ?

হয়তো তা ঠিক নয়। নইলে গান্ধীজীকে দেখে কেন আমার মনে হবে এঁর কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিগগেস করলে করলে ইনি খুব আস্তে আস্তেই বলে দিতে পারবেন আমাদের মতো কমবয়সী মেয়েদের একদিকে কিছু লোভ অন্যদিকে প্রচুর সদুপদেশের লক্ষ্য হয়ে ওঠা ছাড়াও আর কী করার আছে। গান্ধীজী যা বলতেন আমি ধরতে পারতাম এমন সহজ ছিল গান্ধীজীর বলা। কিন্তু সোদপুরের আশ্রমে সেদিন এত ভিড় হয়েছিল, সেই ডিসেম্বরের শীতেও শীত লাগে না মানুষের সান্নিধ্যের উষ্ণতায়। সবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমার কথা আমি তাঁকে বোঝাব কেমন করে ? সেদিন আমার মনে হয়েছিল হিন্দী আর ইংরেজিতে যদি আমি কথা বলতে পারতাম, বেশ হতো, কিন্তু কখনো পারব এমন বিশ্বাস হয় নি।

এই সময়ে বিলেত থেকে আমার নামে চিঠি এলো। লিখলেন বাণীদি। আমাদের ভোরবেলাকার ক্লাসে তিনি ইংরেজি পড়াতেন, বায়রণ আর টেনিসন, ব্রাউনিং, কীট্স—এই সব কবির টুকরো টুকরো কবিতা। ওরই ভিতরে কেমন করে গেঁথে যেত মনের মধ্যে কিছু কিছু ভাব, কোনো কথা। যেমন, হোলী গ্রেল····।

রসা রোড আর সাদার্ন এভিনিউ যেখানে মিশেছে তারই কাছাকাছি ছিলেন তিনি যখন ছিলেন কলকাতায়। কাছাকাছি থাকায় দু তিনদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপদ্রব করেছিলাম বর্মার গল্প শুনতে চেয়ে। ব্রহ্মদেশের বাস ছেড়েই কলকাতায় এসেছিলেন তাঁরা—মহাযুদ্ধের তাড়নাতেই হবে। খুব খুশি হতেন বাণীদি

'আমাদের দেখলে। বড় ভিড়ের কলেজ বলে আমাদের সংগে তাঁর যোগাযোগ হয় না' এ বিষয়ে তাঁকে খেদ করতে শুনেছিলাম। সে হিসেবে বেথুন একটা চমৎকার কলেজ—তিনি বলতেন।

ঐ ভিড়ে ভর্তি ক্লাস থেকে আমাকে তিনি বেছে নিয়েছেন লণ্ডন সহরের চমৎকার বর্ণনা দিয়ে চিঠি দেওয়ার জন্য! আমার কাছে জানতে চাইছেন দেশের খবরাখবর। এতে আমি যেমন আশ্চর্য হয়ে গেলাম, তেমনি আশ্চর্য হলেন আমার বাড়ির অনেকে। আমার কেমন অকারণে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো, ষোলো সতেরো বছর হেলাফেলায় কাটিয়ে দিলেও চেষ্টা করলে হয়তো আমি জেনে নিতে পারবো আরো একটা দুটো ভাষা যাতে আরো সাহিত্যের নিজস্ব জগৎ খুলে যায় আমার সামনে।

॥ ২৩ ॥

রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন বিষয়ে লিখেছিলাম 'হিস্টিরিয়ার' পরে ওর বিষম অবজ্ঞা।' এই একই কথা অনেকের সম্বন্ধে, বিশেষ করে অনেক ডাক্তারের সম্বন্ধে চল্লিশের দশক পর্যন্ত তো রীতিমত প্রযোজ্য ছিল, এখনও আছে কিনা কে জানে। কারো হিস্টিরিয়া হয়েছে বলার সংগে এমন অপ্রীতিকর কটাক্ষ জড়িয়ে থাকতো যে ইণ্টার-মিডিয়েট পরীক্ষার পর থেকে কেবলি যখন আমার বুকে কেমন ব্যথা চলতে লাগল, আমার ভয় হলো, আমাকে আবার হিস্টিরিয়া ধরেনি তো? ভেবে ব্যথাটা লুকোতে গিয়ে বাড়িয়ে ফেললাম।

অসুখ ব্যাপারটা সব সময়েই রহস্যজনক। আমরা তো আমাদের

শরীরের ভিতরটা দেখতে পাই না। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে ডাক্তাররা পান। ডাক্তারদের তাই খুব সাবধানে কথা বলবার কথা। কিন্তু তা সব ডাক্তার বলেন না। হয়তো তাঁরা ধরতেও পারেন না তাঁদের কোথায় ভুল হচ্ছে।

আমাকে হার্টের রোগী সাব্যস্ত করে ডাক্তারদাদা শুইয়ে দিলেন 'অতটুকু মেয়ের আবার হার্টের অসুখ কিসের'—বলে নিকট কি দূর আত্মীয় ডাক্তার যাঁরা দেখলেন এসে এসে, তাঁদেরও মানতে হলো, 'তাই তো, হার্টেরই দোষ দেখা যায়।' —আর এইসব বলাবলি, সমবেদনার ভিতর দিয়ে আমার পৃথিবী একটা রোগীর জগৎ হয়ে উঠল। শুয়ে শুয়েই শ্বাসকষ্ট আসে, আবার চলে যায়! আমি কেবল রোগা হয়ে হয়ে যাই। আমার গান বন্ধ, চলাফেরা বন্ধ, আর কোনো রকম দাবি দাওয়ার প্রশ্ন নেই। আমি এখন খুব তাড়াতাড়ি মরে যাব, না অনেকদিন বাড়ির ওপরে ভার হয়ে থাকব এইটেই এখন প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠল। সমস্ত পৃথিবী আর বাড়ির চেহারা অন্যরকম দেখায়।

খুব অস্থির হয়ে উঠেছিলেন আমার মা। --মেয়ে কি গলগ্রহ হয়ে থাকবে? —এই প্রশ্ন নানাভাবে করে তিনি সম্ভবত খানিক সান্ত্বনা খুঁজতেন বাবার কাছে। ডাক্তারদাদার কাছে, সকলের কাছে। কেউ তাঁকে বলুক যে, না না, তেমন কিছু হবে না। —কিন্তু সান্ত্বনাবাক্যের ব্যাপারে উপস্থিত সকলে বিবেচনা এবং হিসেব মেনে চলতে ভালবাসতেন। মায়ের বেআব্রু কথায় বাড়িতে খানিক উত্তেজনা জমে উঠত শুধু।

আমার দিদি তখন তার সমস্ত বিশ্রাম ভুলে গিয়ে দিনরাত্রের সেবায় লেগে গেল আমার। পথ্য বিষয়ে এতটুকু বিচ্যুতি সে হতে দেবে না। প্রতি ঘণ্টায়, দেড় ঘণ্টায় চামচ মেপে যেমন করে শিশুকে মাপমতো খাওয়ানো চলে তেমনি করে ছোড়দাদা এক ফর্দ লিখে

দিয়েছিলেন, সেটিকে সামনে রেখে দিদি খাইয়ে যেত আমায়। বই পড়ে শোনাত, চুল বেঁধে দিত কাছে বসে। এত অন্যায় যত্ন নেওয়ার পরে আমার শরীর বোধ হয় লজ্জা পেল। বর্ষা নামতে আমার শ্বাসকষ্ট কিছু কমে এলো। ছোড়দাদা বললেন, ওষুধের ফল হচ্ছে। —পরীক্ষার ফল বেরোতেই আমি অনার্স পড়বার জন্য কলেজে ফিরে গেলাম। ছোড়দাদা বললেন, এ সব করতে গিয়ে ফের যদি ও বিছানা নেয়, আমি কিছু করতে পারব না।

আমি ভীষণভাবে খাওয়াদাওয়ার নিয়ম মানতে মানতে আর বেরিন গিলতে গিলতে বললাম, আর আমি বিছানা নিলে তো?— কিন্তু প্রত্যহ সিঁড়ি দিয়ে তিনতলা চারতলা ওঠানামা ক্ষতিকর হবে আমার পক্ষে। ভোরের চেয়ে দুপুরের কলেজে যাওয়া নানাভাবেই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় জেনে বাবা আমাকে কলেজ পালটে বেথুনে চলে যেতে অনুমতি দিলেন। এর ভিতরে আমার দিদির বিয়ে হয়ে গেল। তারো মাসখানেকের মধ্যে শুরু হলো ছেচল্লিশের দাঙ্গা।

আমার অসুখের মতোই দাঙ্গার স্মৃতিকে আমার অনৃত বলে ঝেড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। অথচ সেদিন দাঙ্গার চেয়ে বেশি কঠিন সত্য আর কী ছিল? যে সান্ধ্য আইনকে এতদিন অন্যায় বলে জেনেছি সেই সান্ধ্য আইন জারি হলে যেন বেঁচে যায় একেকটা অঞ্চল, তখন পথে মৃতদেহ পড়ে না, কেন না পথে লোক বের হয় না। পুলিশের আশায় পথ চেয়ে থাকে বেপাড়ার হিন্দু, মুসলমান,—কখন তাদের সম্প্রদায়ের কাছাকাছি পৌঁছে দেবে পুলিশ নিরাপদে। রাত্রিবেলায় সাড়া মহল্লা পাহারা চলে। আশে-পাশের মানুষদের মুখ চেনা যায় না আর। হিংস্র কথা মুখে মুখে ফেরে। ভয়ে ভয়ে আরো বেড়ে যায় হিংস্রতা। হঠাৎ একটি দুটি বন্ধুর মুখে সহজ

মানুষের চেনামুখ দেখতে পাই। তাদের কাছাকাছি থাকতে ইচ্ছে করে! কিন্তু যাওয়ার উপায় কী?

দুহয়ে যোগাযোগে তখন বাধা পড়তো প্রায়ই। একদিন দু নম্বর বাসে চেপে দীর্ঘ ছুটির পরে কলেজে যাচ্ছি। ভবানীপুর পাড়া দিয়ে বাস না-থেমে চলে যাবে।—পাশের সীট থেকে ভদ্রমহিলা জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে হাত নেড়ে কোনো বারান্দার উদ্দেশ্যে বলতে গেলেন, ঝণ্টু, নামতে পারলাম না তোদের বাড়িতে। উল্টে এখন ফিরে যাচ্ছি। বুঝলি? কারফিউ, কারফিউ।

ও পাড়ায় তখনো সান্ধ্য আইন, এ পাস-ও-পাস খেলা। দেশ কি তবে ভাগ হয়ে যাবেই?

কলেজ খোলার পরে এ নিয়ে বিতর্ক করেছি আমরা 'দেশ-বিভাগের ফলাফল কী হবে।' কোনো চালু পত্রিকা দেশবিভাগ বিষয়ে জনমত সংগ্রহ করে এ বিতর্ককে আরো সূচীমুখ করে তুলে-ছিলেন। মনে হতো আমার আবার অসুখ করে যাবে। ক্লাসের লীলা বলত, তুমি ওরকম আবেগ দিয়ে দেখবে না ব্যাপারটাকে। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ, পার্টিশন ছাড়া আমাদের উপায় নেই। এই রকম এক একটা দাঙ্গা চলবে, আর আমরা থাকবো—ভাবতে পারো?

অসুখের পরে একটানা তর্ক করবার জোর আমার কমে গিয়েছিল তাই লীলার সংগে বন্ধুত্ব রক্ষা পেত। প্রথম প্রথম কলেজে পৌঁছে প্রায়ই আমি কোনো এক কোণের ঘরে শুয়ে দম ফিরে পাওয়ার জন্য চুপচাপ অপেক্ষা করতাম। লীলা এসে বসতো আমার কাছে। এমনি তাবে সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল আমাদের। খুব স্নিগ্ধ, শান্ত মেয়ে ছিল লীলা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে প্রথম মেয়েপুলিশ নেওয়া শুরু হলে সেই চাকরী নিল ও, কেন না ওর একটা বাঁধা চাকরির বিষম দরকার ওর বাড়ির জন্যে। এ রকম বিপরীত বৃত্তিতে আমাদের লীলা হারিয়ে যাবে তখন আমরা জানতাম না।

লীলার সংগে আমার যোগ ছিল পাসক্লাসে বসে নানা কাগজ চালাচালিতে কিংবা মুখ টিপে হাসায়। অনার্স ক্লাসে সে যোগ থাকত না। দর্শন বিষয় নিয়ে যারা পড়তে এসেছিল তাদের ভিতরে আমি পেয়েছিলাম স্বপ্নাকে। আমাদের বন্ধুত্ব যাকে বলা হয় দীর্ঘস্থায়ী তাই হয়েছিল। সাহিত্যে রুচি ছিল ওর, সুর ছিল গানে, নানাবিষয়ে আগ্রহ। এক কলেজে পড়লেও আমরা দুজনে দুই পাড়াতে থাকতাম। সে বাধা কাটিয়েও আমাদের বন্ধুত্ব যতটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তাতে বোঝা যায় শুধু আগ্রহে নয়, আমাদের মনের মিলেই আমাদের কাছাকাছি রেখেছিল!

এদের নিয়ে আমার কলেজের দিন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। বাইরে শোভাযাত্রা যায়: হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই হৈ, ভুলো মৎ, ভুলো মৎ। —আমরা জানলা দিয়ে দেখে ফের টেবিলের ধারে গিয়ে বসি। ঘরের নাম লাইব্রেরী ঘর। ঝাপসা হয়ে আসা অক্ষরে কোনো দরজার মাথায় লেখা রয়েছে রিডিং রুম। কিন্তু সেখানেই বসে সকলে। তিনতলাতে যে মস্তো বড়ো কমন রুম রয়েছে সেখানে কিছু নেই আকর্ষণ করার মতো। ধর্মভীরু দু-চারটি মেয়ে সেখানে উঠে গিয়ে মেঝেয় বসে আড্ডা জমানোর কথা বলে। সংখ্যাগুরুর ভোটে সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। আমার বিশুদ্ধ ধার্মিক অজুহাত স্বাস্থ্যের। সেই অজুহাতে আমি ক্লাসঘর ছেড়ে অল্পই নড়ি চড়ি। আমার তিনতলায় যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবু টিফিনের ঘণ্টা কেটে গেলেও পাঠাগারে গুঞ্জন কেন বলে অধ্যাপিকারা শাসন করতে এলে সকলের সংগে সে বকুনি ভাগ করে নিই বলে আমি সহপাঠিনীদের ভিতরে একরকম জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেললাম এবারে অল্পদিনের মধ্যেই।

সে জনপ্রিয়তা বেড়ে গেল সিনিয়র মেয়েদের বিদায় উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, রব দেওয়া-

দেওয়ি নিয়ে জড়িয়ে রয়েছে যারা, তাদেরই পাণ্ডামি করতে দেখা যায় বলে সকলে জানতেন। ইউনিয়নের ভোট চাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ বা যোগ্যতা নেই, শুধু শুধু জনাকতক গুণী মেয়েকে জড়ো করে স্টেজ বেঁধে নাটক নামিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা খুব নতুন লেগেছিল অনেকের। বড্ড গুণী কয়েকটি মেয়েকেই পাওয়া গিয়েছিল ধারেকাছে। বকাবকি করে তাদের রিহার্সেলে নিয়মিত ধরে রাখার যোগ্যতা আমি দেখিয়েছিলাম ঠিকই। সব মিলে চমৎকার উৎরে গিয়েছিল দিলীপকুমার রায়ের জলাতঙ্ক। তিনতলার সেই কমন রুমের ব্যবহার হয়েছিল এ অনুষ্ঠানে। দড়ি বাঁধা পর্দা একবার মাত্র বেকায়দায় ছিঁড়ে গিয়েছিল। তাতে একটুও না হেসে রীতিমত নাট্যগোষ্ঠীর যোগ্য মানমর্যাদা রেখে এ হাসির নাটকটি নামানো গিয়েছিল। বিদায়ী দিদিরাই শুধু নয়, অধ্যাপিকারাও হাস্যে আন্দোলিত হয়েছিলেন, অভিভূত হয়েছিলেন ছাত্রীদের গুণপণায়। আমরাই কেবল উপযুক্ত অচাঞ্চল্য রক্ষা করে শেষ পর্যন্ত জলাতঙ্ক সমস্যার সমাধান এনেছিলাম। একটা দারুণ ব্যাপার।

এর পরে ছোটখাট কলেজী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে গেল। সেই যে একবার অসুখ এসে আমাকে শুইয়ে ফেলেছিল একেবারে, আবারও কোনদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে সে হয়তো ডেকে আনবে মৃত্যুকে, হঠাৎ দোতলা বাসের একতলা জানলার মুখোমুখি হয়ে যাবো তার সংগে—এই অস্পষ্ট অনুভূতি আমাকে থেকে থেকে সমস্ত বন্ধুর কাছে অনধিগম্য করে দিলেও সকলের সংগে আমার আড়াল তেমন আর রইল না, যেমন ছিল এ অভিনয়ের আগে। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে গানের দলে জুটে যেতে আমার একটুও দেরি হলো না।

॥ ২৪ ॥

আমরা যখন ব্যাকুলভাবে দেশবিভাগের শুভাশুভ ফলের হিসেব কষে যাচ্ছি, দেশের ভাগ্যবিধাতারা তখন আমাদের গাণিতিক বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে বসেছিলেন তা নয়। তাঁদের হিসেব চলছিল অন্য খাতে! দাঙ্গা ধুঁইয়ে উঠছিল একবার পূবে, একবার পশ্চিমে, ফের ফিরে পূবে, আর গান্ধীজী ঘুরে ঘুরে দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। তাঁকে কাছাকাছি পেলে কেউ ছোটে আশ্রয় নিতে, কেউ কঠিন নালিশ জানাতে—তিনি কি প্রশ্রয় দেবেন অন্যায়কে? তাঁর প্রার্থনা সভা রামধুন ছড়ায়। আমরা ভরসা করতে চাই। আমরা রাম জানি না। রহিম জানি না। আমরা গান্ধীজীর ভরসাই চাই। যার বলে তিনি ঘোর দাঙ্গাগ্রস্ত অঞ্চলে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে হানাহানি থামাতে চান, সেই শক্তির বিশ্বাসের ভাগ চাই। আমরা কি মরে যাবো? আমরা কি সবাই খুনী হয়ে যাবো? —আমাদের অর্বাচীন প্রশ্নে দেশের ভাগ্যবিধাতাদের কান ছিল না। তাঁরা বিলিব্যবস্থা করছিলেন দেশের মাটির।

স্বাধীনতা আসছে—আমরা বলাবলি করতে শুনেছিলাম কাউকে কাউকে। —কী হবে? এই তো দশা দেখতে পাচ্ছ। —বলেছিলেন কেউ কেউ। অন্য অনেকে প্রস্তুত ছিলেন আবেগে আপ্লুত হবার জন্য। —আমাদের দেশবাসীর সাধনা, মর্মবেদনা। তার মূল্য কি আমরা দিতে পারবো? —টেনে টেনে বলতেন তাঁরা বক্তৃতায়

মতো! স্বয়ং তটিনীদি একদিন আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে ডেকে ফেললেন আমাদের, তাঁর অনার্স ক্লাসের ছাত্রদের। দপ্তরগত কাজ এতো ব্যস্ত রেখে দিত তাঁকে যে তিনি নির্ধারিত সময়ে আমাদের সংগে দেখা করে উঠতে পারতেন না প্রায়ই।

তাঁর অফিস আর নিবাস ছিল একত্র। ক্লাস নেবার জন্য তিনি সেখান থেকে নেমে কলেজে আসতে পারতেন না। নির্দেশ থাকতো আমাদের যাওয়ার। তাঁর অফিস ঘরের উঁচু দরজায় ঝুলোনো পর্দার সামনে আমরা চার পাঁচটি ছাত্রী তিতিরপক্ষীর মতো অপেক্ষা করে যাচ্ছি, তিনি হয় দপ্তরে ব্যস্ত, নয়তো জন-সংযোগে, কিংবা তিনি গোসলখানায় রয়েছেন,—এতেই অভ্যস্ত ছিলাম আমরা। মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ পেতাম তাঁর। খুব দক্ষ শিক্ষকের মতো সেইটুকু সময়েই অনেকটা বিষয় বুঝিয়ে দিতেন তখন। কিন্তু আজ আমরা তাঁর খাশ কামরায় প্রবেশাধিকার পেলাম তাঁর মতামত শুনতে। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ ঠিক যেমনটি বলেছিলেন তেমনি-ভাবেই কী লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে ইংরেজ এই ভারত সাম্রাজ্যে ত্যাগ করে যাচ্ছে? ভারতের কথা কি আমরা ভাবি? আমরা কি জানি যে আমাদের প্রত্যেকের ব্যবহার ভারতের দীনতাকে বাড়িয়ে তোলে? বলতে বলতে আরো অনুপ্রেরণা বোধ করে সভ্যতার সংকট আরো খানিকটা শুনিয়ে দিলেন তিনি।

দৈবগত বিষণ্ণতা অকস্মাৎ কাউকে গ্রাস না করলে আঠারো বছর বয়সে কোনো সংকটকে কেউ সংকট বলে মানে না। যে সখীকে আমরা সমস্ত মেয়েলি সম্বোধন প্রথাবহির্ভূত-পথে 'পাইন' বলে ডাকাডাকি করতাম, সে বেরিয়েই বললো, কতদিন ধরে মানসীকে বলছি কুঁজো হয়ে বসবে না। ঐ দেখেই তো দীনতা-টিনতার কথা মনে পড়ে গেল ওঁর। —টিফিন ঘরে মুড়িওয়ালী বউ-এর সামনে

দাঁড়িয়ে চপলভাবে একটু হাসাহাসি হলো। তারপরে/স্বপ্না আর আমি গেলাম পনেরোই আগষ্ট অনুষ্ঠানের মহড়ায়।

স্কুল আর কলেজ যৌথভাবে অনুষ্ঠান করেছিল। মস্তো বড় মাপে আয়োজন হয়েছিল। একটি দুটি বিশেষ বাছাই গান রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই এসে যত্ন করে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের। 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী' গাইতে গাইতে রোমাঞ্চিত হতে ইচ্ছে করতো আমাদের।

যে সব রোমাঞ্চিত প্রাণে স্বাধীন ভারতে শুভবিবাহ সাজাবার সাধ ছিল তাদের ভিতরে মায়ের মা-মরা নাতনী ছিলেন। পনেরোই ছুটির দিন হয়ে যাওয়ায় তার খেদ কম হয়নি। ষোলই পৌঁছলে গিয়ে দাঁড়াতে হয় ভরা ভাদ্রে। একে সাধ করে কাগজে কলমে আধুনিক বিয়ে, তার উপরে ভাদ্র মাসের ভার সইবে না বিবেচনায় চোদ্দই আগস্টেই বিয়ের রেজিস্ট্রারকে ডেকে নিয়ে এসে অনুষ্ঠান চুকিয়ে ফেললো তারা। নিজের বাড়িতে কিংবা দপ্তরে যখন জিন্না, লিয়াকত, নেহরু, প্যাটেল আসন্ন সন্ধি কল্পের চিন্তায় জড়িয়ে আছেন, সেই সন্ধ্যেবেলায় ছোড়দাদাদের আস্তানায় আমাদের বাবা-মার নাতনী খুব অনাড়ম্বর যাকে বলে সেই ভাবে কালো বুটিদার একখানি সুন্দর শাড়িতে সেজে....তোমাকে আইনত বিবাহিত স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিলাম—বলে ছোটখাট বৈপ্লবিক কৃত্যের সাধ মেটালেন।

মা ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগলেন, নাতজামাইয়ের গলাটায় মালাগাছি রাখতে আপত্তি কি? যে ভাবেই করো না বিয়ে, বিয়ে একটা বন্ধন বটে তো?

বাবা মিষ্টির থালা সরিয়ে দিয়ে হেসে বললেন, আমি তো খাব না, আমিও প্রতিবাদ করবো। আমায় বোঝানো হোক এ রকম বিয়ের কী দরকার ঠিক ছিল। হিন্দু মতে বিয়েটা হলে আমরা ইতর জন একটু বেশি আনন্দ করতাম।

সন্ধ্যে হতে না হতে ওরা চলে গেল নিজেদের বাড়িতে। আমরা শেষ রাত্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিতে গেলাম। নেহরু বলেছিলেন, অদৃষ্টের সংগে আমাদের এই অভিসার ছিল… আমাদের ঘরে এখন দিদি নেই। কোলের মেয়ে নিয়ে চলে গেছে শ্বশুরবাড়িতে। বাবা আধশোয়া বিছানায়। সেজদাদা আর আমি বাবার বিছানার কাছাকাছি রেডিও-র ধারে বসে আছি। মা দরজার কাছে এসে বসেছেন, মাঝে মাঝে বলে উঠছেন, কত ক্ষুদিরাম বলিদান হলো, তাদের কথা বলবে কি আর আজ? কত যন্ত্রণা… বলতে বলতে নিজের মনেই থেমে যাচ্ছেন তিনি।

সেই বিশেষ দিনটির এই ছবি ফিরে ফিরে এসেছে কতবার আমার চোখে।

খুব সকালে পতাকা উড়বে কলেজে, সকাল হতেই চলে গিয়েছিলাম আমি কলেজপাড়ায়। লালপাড় শাড়ি, সাদা জামায় ভরে গিয়েছিল কলেজের চত্বর। অনেকে সংগে এনেছিল বাড়ির ছোটদেরও সাদায় সাজিয়ে অনুষ্ঠান দেখে যেতে।

প্রাচীন রাজবন্দীদের কে-এক-জন এসেছিলেন অনুষ্ঠানের আতিথ্য নিয়ে। ছোট মেয়েরা স্কুল থেকে আর কলেজ স্তরের ট্রেণিং কোর-এর মেয়েরা কুচকাওয়াজ করেছিল। ছেচল্লিশে শা-নওয়াজ সম্বর্ধনার সেই বাদ্যসঙ্গীত-মঙ্গলগীতির প্রভাব বেশ খানিকটা ছিলো তখনও। কদম কদম বঢ়ায়ে জা বেজে উঠতো সহজেই। 'চলো দিল্লী' কথাটা ধ্বনির মতো এসে গিয়েছিল অনেকের কাছে। বসুপন্থার ভিতরে ফ্যাসিবাদ দেখতে পেতো এমন ছাত্রছাত্রীরও অভাব ছিল না তা নয়। অন্যদিন এসব পরস্পর ক্রোধ দেখা যেত সহজে কিন্তু আজকের দিনে কেউ বেসুর কথা বলবে না। সকলেই অনুষ্ঠানের আঙ্গিক নিয়ে ব্যস্ত। কোনো দীনতা দেখা যাচ্ছিল না কোথাও। অন্তত

একদিনের জন্যও সকলেরই বোধ হয় ভুলে যেতে ইচ্ছে করছিল সব রেষারেষি, এমন কি, একবছর আগের আগস্টকেও।

পরের ভাবনা তো রইলই পরের জন্য। কে না জানে, ভাবতে হবে আজ না হোক তো কাল, আর নয়তো পরশু। মুর্শিদাবাদ তো যায়নি ভিন্ন ভাগে। যেতে গিয়েছে খুলনা—যশোর। বড়মামা কি হাসতে পারবেন? নিশ্চিন্তভাবে পা দোলাতে দোলাতে বলতে পারবেন, খুলনের মতো জায়গা হয় না। আমার দিদিরও শ্বশুরবাড়ির দেশ খুলনা। খুলনা শহরের বাড়িতে সে তার প্রথম সংসার পেতে আমায় খেতে লিখেছিল এই কিছুদিন আগেই। তারপর নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সংগে সরকারী নির্দেশে যেতে হলো নতুন জামাইবাবুকে, দিদি কলকাতায় শাশুড়ীর কাছে চলে আসায় আমার যাওয়া হলো না আর ফিরে খুলনায়। তেমনি, আমার মতো পূর্ব বাংলার কেউ হয়তো আসবে ভেবেছিল বহরমপুরে ঈদ উৎসবে। সেখানে, ব্যারাকের পথে পথে সবুজ পতাকার মালা সাজাবে বলে যারা তৈরি হয়েছিল, তারা কি তেমনি হেসে উৎসব করছে যেমন চলেছে আজ কলকাতার পথে পথে, টালিগঞ্জ, ভবানীপুর, পার্কসার্কাস, বড়বাজার—এমন কি, ফিয়ার্স লেনেও?—এসব পরের ভাবনা। ভাবতে নেই এখন। আজকের দিন উৎসবের।

গান্ধীজী তখনই ভাবছিলেন পরের ভাবনা। কিংবা, হয়তো পুরনো ভাবনাও। মুক্তি পেল একটি নয়, দুটি জাত, একি মুক্তি? সত্যিই মুক্তি? তাঁর খেদ, গভীর বিষণ্ণতা অল্প অল্প উল্টো হাওয়া বইয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে কেবল মনের ভিতরে তাকালে। সে দৃষ্টি ফেলবার সময় তোমাকে আজ দিচ্ছে কে?

চোখ মেললেই পথে পথে কোলাকুলি, ইচ্ছেসুখ বাসভ্রমণ, আর কী সুন্দর সাজিয়েছিল বাসগুলিকে যেমন তেমন খুশি। মানুষের

ভিড় কোথায় না উঠেছিল, কী ভাবে ঝুলেছিল বাস্ থেকে। এখনকার মতো রাগ কিংবা ক্লান্তিতে ঝুলে থাকা নয়, হাসিতে উজ্জ্বল দোল খাওয়া, ছাতে ওঠা। সব অন্যরকম সেদিনের।

আমাদের অনুষ্ঠান সারা হয়ে গেলে আমরা হেঁটে দল বেঁধে 'যেদিন সুনীল জলধি'র সুর গলায় খুব একটুখানি রেজের মতো নিয়ে গেলাম রূপবাণী ছাড়িয়ে আরো দূরে, অনেকখানি পথ উল্টো দিকে চলে গেলে দক্ষিণের বাসে উঠে পড়বার মতো ফাঁক পাবো। একটু গরম ছিল দিন, হলোই বা গরম। সবাই কি খবর জানে কল্পনাবিলাসী কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী বলছে ছোটলাটের বাড়িতে এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যাওয়া হবে, বাজারের চাপ থেকে কলকাতার ফুসফুসের কাছাকাছি মুক্তি পাবে বিশ্ববিদ্যালয়? অবশ্য সক্রেতিস বাজারেই দর্শন বিলোতেন। আর, বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় নতুন কফি হাউসের আকর্ষণ তো টানছে এখন সবাইকে। তবু, এসপ্লানেড পাড়ায় এলে তার সংগে আর কিসের তুলনা? আর, বেলভেডিয়রে কী হবে? কেউ জানে না। খোঁজ নিলেই হবে পরে। পালিয়ে তো যাচ্ছে না কিছু। চৌরঙ্গীর অনধিগম্য এলাকাও এখন আমাদের। এ তো আমাদেরই সময়। মঞ্জু বললো, আমরাই প্রথম স্বাধীন দেশের ডিগ্রী পাওয়ার দল। ভাবতে কি রকম লাগে না? এর আগে সব ছিল অন্য।

পাইন বললো, আগে পরীক্ষায় বসি। পাশ করি বাবা।

তারপরে আমি বাস স্টপে পৌঁছে গেলাম। বাসে একবার উঠে বসতে পারলে গিয়ে উঠবো বাড়িতে—একটু বেলায়। হলোই বা বেলা। আজ কখনো কেউ ভাবনা করবে না। আজ শুধুই খুশির দিন। শহীদ বেদীতে মাল্য অর্পণ সারা। পাড়ায় পাড়ায় প্রভাত ফেরীর দল ফিরছে। সন্ধ্যাবেলায় আলোকসজ্জা হবে।